দারসুল কুরআন

প্রথম খণ্ড

মাওলানা হামিদা পারভীন

দারসুল কুরআন

[প্রথম খণ্ড]

মাওলানা হামিদা পারভীন
কামিল হাদীস, কামিল তাফসীর, এম. এ
মুহাদ্দিস
মদীনাতুল উলূম মডেল ইনষ্টিটিউট মহিলা কামিল মাদরাসা
তেজগাঁও, ঢাকা।

সম্পাদনা
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক
এম. এম, এম. এ
অধ্যক্ষ, মাদরাসা-ই-বাইতুল মা'মূর
সেনপাড়া পর্বতা, মিরপুর, ঢাকা।

আরজু পাবলিকেশন্স
৬০/ডি, পুরানা পল্টন, ঢাকা [illegible]

পরিবেশনায়

ঢাকা বুক কর্ণার
৬০/ডি, পুরানা পল্টন, ঢাকা [illegible]
ফোন [illegible]

দারসুল কুরআন
মাওলানা হামিদা পারভীন

প্রকাশক ঃ
মাওলানা আমীনুল ইসলাম
আরজু পাবলিকেশন্স
মোবা : ০১৭১১-০৩০৭১৬

প্রথম প্রকাশ ঃ
জুলাই ২০০৭ইং

দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ
১ মার্চ ২০১১ইং

প্রচ্ছদ ঃ
মুবাশ্বির মজুমদার

বর্ণ বিন্যাস ঃ
এ জেড কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
৪৩৫/এ-২ বড় মগবাজার, (৩য় তলা)
ঢাকা-১২১৭, ফোন ঃ ০১৫৫২৪২৯৬৪৭

মুদ্রণ ঃ
বাংলাবাজার প্রেস
৫৮, প্যারিদাস রোড, ঢাকা।

বিনিময় ঃ নব্বই টাকা মাত্র।

Darsul quran-1 : by Maulana Hamida Parvin, Published by Arju Publication 60/D Purana Palton, Dhaka.

Price : Taka 90 Only.

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده ونصلى على رسوله الكريم

পবিত্র কুরআন হলো মানুষের জীবন বিধান। মানব জাতির প্রকৃত কল্যাণ ও অকল্যাণের সঠিক পরিচয়ই কুরআনে বিধৃত হয়েছে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন ঃ বস্তুত এটা মানব জাতির জন্য সুস্পষ্ট সতর্কবাণী এবং আল্লাহকে যারা ভয় করে তাদের জন্য এটা পথ নির্দেশ ও কল্যাণের উপদেশ। (আলে ইমরান ঃ ১৩৮)। আল কুরআনের বাস্তব অনুসরণের মাধ্যমেই মানুষ দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনকে শান্তি ও কল্যাণময় করে তোলতে পারে। রাসূলে পাক (স) এবং সাহাবায়ে কেরামের পূত পবিত্র জীবন ছিল আল কুরআনের সঠিক বাস্তবায়নের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তারা পূর্ণ মর্যাদা সহকারে কুরআন অধ্যায়ন করতেন, এর মর্ম ও তাৎপর্য অনুধাবন করতেন এবং নিজেদের জীবনে আল কুরআনের বিধানকে কার্যকর করতেন। তাই তাদের যুগ ছিল ইসলামের সোনালী যুগ। কুরআনের শিক্ষা থেকে দূরে থাকার কারণেই আজ বিশ্বের মুসলিম জনগোষ্ঠী অমুসলিমদের হাতে নির্যাতিত ও নিস্পেষিত হচ্ছে। রাসূল (স) বলেছেন ঃ "আমি তোমাদের মাঝে দু'টো জিনিস রেখে যাচ্ছি। এ দু'টিকে যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আঁকড়ে ধরে রাখবে ততক্ষণ তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। উহা হলো আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নত। (মিশকাত, মুয়াত্তা)

অতএব আমাদেরকে অতি দ্রুতগতিতে কুরআনের দিকে ফিরে আসতে হবে। গভীরভাবে কুরআন অধ্যয়ন করতে হবে। দারসুল কুরআন তারই একটি প্রয়াস মাত্র। আরবী দারস শব্দের অর্থ পাঠ, শিক্ষা, আলোচনা, পর্যালোচনা ও গবেষণা ইত্যাদি। ইংরেজীতে যাকে Study বলা হয়। কুরআন স্টাডি করা না হলে, কুরআন থেকে প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করা কখনো সম্ভব নয়। জীবনকে আলোকিত করার জন্য কুরআনের শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। বইটিতে আমরা কুরআনের ব্যবহারিক অর্থ, ব্যাখ্যা ও শিক্ষা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। বইটি জ্ঞান পিপাসু ভাই বোনদের কুরআনের জ্ঞান আহরণে সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ ও মানুষকে কুরআনের দিকে আকৃষ্ট করাই এর লক্ষ্য।

বইখানা লেখায় উৎসাহ যুগিয়েছেন এবং গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন আমার স্বামী প্রবর মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে উত্তম প্রতিদান দিন।

গ্রন্থখানি জ্ঞান পিপাসু পাঠক-পাঠিকাদের হাতে নির্ভুলভাবে তুলে দেয়ার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও যদি কোন ভুলত্রুটি কারো নজরে পড়ে তবে দয়া করে আমাদের অবহিত করলে কৃতজ্ঞ থাকবো।

পরিশেষে দয়াময় আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ, তিনি যেন এ প্রচেষ্টা কবুল করেন এবং পরকালে আমাদের নাজাতের অসীলা করে দেন।

বিনীত

তারিখ ঃ ১লা জুলাই ২০০৭ ইং

মাওলানা হামিদা পারভীন
১০, পূর্ব তেজতুরী বাজার, ঢাকা।

সূচীপত্র

প্রসঙ্গ কথা

আল-কুরআনের পরিচয়

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যুগে যুগে দুনিয়ার মানুষের হিদায়াতের জন্যে অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। আর তাঁদের ওপর নাযিল করেছেন আসমানী কিতাব। আল-কুরআন হচ্ছে আল্লাহ তা'য়ালার সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব। ইহা ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মৌলিক উৎস। এতে রয়েছে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনার নিয়ম-নীতিসহ জীবনের সকল সমস্যার সমাধান। ইহা মহান আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর তেইশ বছরের নবুয়াতী জিন্দেগীতে তাঁর ওপর অবতীর্ণ হয়।

আল-কুরআনের নামকরণ

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন পৃথিবীর সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ। তাই এর প্রধান নাম আল-কুরআন। আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশে হযরত জিবরাঈল (আ) মহানবী (স)-কে প্রতি রমযানে পাঠ করে শুনিয়েছেন। আবার মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) মানুষকে পাঠ করে শুনিয়েছেন। সারা দুনিয়ার মানুষ অদ্যাবধি এ মহাগ্রন্থ পাঠ করছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত এভাবে পাঠ করতে থাকবে। এরূপ সঙ্গত কারণেই এ গ্রন্থের নাম আল-কুরআন রাখা হয়েছে।

কুরআন শব্দের অর্থ

কুরআন শব্দটি فُعْلاَنٌ (ফু'লানুন) ওযনে قَرَءَ-يَقْرَءُ এর ক্রিয়ামূল (মাসদার) এটা قَرْأٌ হতে নির্গত। قُرْاٰنٌ শব্দের অর্থ مَقْرُوْءٌ (পঠিত)। যেমন (كِتَابٌ) কিতাব অর্থ মাকতুব (مَكْتُوْبٌ) লিখিত। কুরআনকে এজন্য কুরআন বলা হয় যে, এটা রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে জিবরাঈল (আ) কর্তৃক পঠিত হয়েছে। তাছাড়া গোটা মুসলিম মিল্লাতের অগণিত মানুষের কণ্ঠে নিয়মিত পঠিত হয়ে আসছে। অথবা কুরআন অর্থ مَقْرُوْنٌ (সংযুক্ত) যা قَرْنٌ হতে নিঃসৃত। যেহেতু কুরআনের এক আয়াত অপর আয়াতের সাথে সংযুক্ত

এবং সংযোজিত এ জন্য এটাকে কুরআন বলা হয়। পরিভাষায়-কুরআন আল্লাহর কালাম, যা রাসূল (স)-এর ওপর অবতীর্ণ, নির্দিষ্ট সংকলনে রক্ষিত ও রাসূল (স) হতে সন্দেহাতীতভাবে ধারাবাহিক বর্ণনায় বর্ণিত। কুরআন শব্দ ও অর্থের সমষ্টিগত নাম। অর্থাৎ কুরআনের ভাব ও ভাষা উভয়ই আল্লাহর তরফ থেকে আগত।

আল-কুরআনের নামকরণের তাৎপর্য

কি তাৎপর্য ও সাদৃশ্যের কারণে আল্লাহর এ কিতাবের নাম আল-কুরআন নামকরণ করা হয়েছে তার ব্যাখ্যায় অনেক তাফসীরকারকগণ বিভিন্ন বক্তব্য পেশ করেছেন। নিম্নে আল্লামা তাকী উসমানী (র) এর বক্তব্য উল্লেখ করা গেল। "পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় আরবের অবিশ্বাসীরা এ কুরআনের পবিত্র বাণী শুনতে চাইত না। কুরআন তিলাওয়াতের সময় তারা নানারূপ হট্টগোল ও শোরগোল করত, যাতে করে কুরআনের মোহনীয় বাণী তাদের কানে না পৌঁছে এবং বুঝতে না পারে। কাফিরদের এ হীন আচরণ ও অশ্লীল ব্যবহারের জবাবে "اَلْقُرْاٰنُ" (পঠিত গ্রন্থ) নাম রেখে বুঝানো হচ্ছে ঃ তোমরা যতই কুৎসিত আচরণ দ্বারা কুরআনের সুমহান বাণীকে ঠেকাতে চাও, কিন্তু কিছুতেই তা পারবে না। পবিত্র এ কিতাব 'পঠিত' হওয়ার জন্যই অবতীর্ণ করা হয়েছে। কিয়ামত পর্যন্ত তা পঠিত হতেই থাকবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে আজ পর্যন্ত সর্বজনবিদিত ও স্বীকৃত সত্য হচ্ছে পৃথিবীতে একমাত্র কুরআনই সবচেয়ে বেশী পঠিত ও পঠিতব্য গ্রন্থ।" (উলূমুল কুরআন ঃ তাকী উসমানী ঃ ২৪)

কুরআন অবতীর্ণের সময়-কাল

রাসূলুল্লাহ (স) এর নবুয়ত লাভের পর হতে তাঁর উপর দীর্ঘ তেইশ বছরে প্রয়োজন অনুসারে সমগ্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। প্রথমতঃ মক্কায়; তারপর মদীনায়, বিভিন্ন অবস্থায় এ কুরআন অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ তা'য়ালা নিজেই কুরআন মজীদের সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ.

অর্থ ঃ আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং নিশ্চয়ই আমি উহার সংরক্ষণকারী। (সূরা আল-হিজর ঃ ৯)

কুরআন জিবরাঈল (আ) রাসূল (স)-এর বক্ষে প্রবেশ করিয়ে দিতেন এবং তা তিনি ভুলতেন না। অতপর তিনি (স) উহা অন্যকে পড়াতেন। তাছাড়া রাসূল (স) অহী নাযিলের সঙ্গে সঙ্গে সাহাবায়ে কিরাম হতে কয়েকজন কাতিবকে তা লিখে রাখার নির্দেশ দিতেন।

কুরআন সংরক্ষণ পদ্ধতি

পবিত্র কুরআন মজীদ প্রধানত দু'টি পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হয়। যথা ঃ

১. স্মৃতি ভান্ডারে।

২. লিখন পদ্ধতির মাধ্যমে।

১. স্মৃতি ভাণ্ডারে ঃ অন্যান্য আসমানী গ্রন্থাবলীর তুলনায় একমাত্র কুরআনই এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যে, এর হিফাযত ও সংরক্ষণের জন্য কলম ও কাগজের তুলনায় অধিক নির্ভর করা হয় স্মৃতিভান্ডার তথা হাফিযদের স্মরণ শক্তির ওপর। হৃদয়ে ধারণের ব্যাপারে আল্লাহ পাক বলেন, "বস্তুত যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তাদের অন্তরে এটা স্পষ্ট নিদর্শন।" (সূরা আনকাবূত ঃ ৪৯)

হাদীসে কুদসীতে এ মর্মে বলা হয়েছে, "আপনার প্রতি আমি এমন একটি কিতাব নাযিল করেছি, যাকে পানিও মুছে ফেলতে পারবেনা " (মুসলিম)

২. লিখন পদ্ধতির মাধ্যমে ঃ পবিত্র কুরআন নাযিল হওয়ার মুহূর্তেই অহী লেখক দ্বারা তা লিপিবদ্ধ করা হতো। এ ধারা পরবর্তী যুগে লিপিবদ্ধ ও মুদ্রণের মাধ্যমে পবিত্র কুরআন অবিকল লিপিবদ্ধ আকারে সুরক্ষিত হয়ে আসছে। পবিত্র কুরআন লিখন ও সংগ্রহ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে বিস্তারিত প্রামাণ্য বিবরণ আছে। মহানবীর সময়ে কাগজ ও মুদ্রণ শিল্প সহজ ছিল না। তাই মানুষ বিভিন্ন জিনিসের ওপর লিখে রাখত।

কুরআন সংকলনের ইতিকথা

নবী করিম (স) এর জীবদ্দশায় কুরআন মজীদ কোন নির্দিষ্ট পাণ্ডুলিপিতে একত্রে লিপিবদ্ধ ছিল না; বরং বিচ্ছিন্নভাবে খেজুর পাতায়, হাড়ে, পাথরে, পাতলা চামড়া ইত্যাদিতে লেখা ছিল। সাহাবায়ে কিরামের অনেকে সমগ্র কুরআন মুখস্থ করে রেখেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স) এর ওফাতের সাথে সাথে যখন কুরআন অবতীর্ণ বন্ধ হয়ে যায় এবং হযরত আবু বকর (রা) এর খিলাফতের সময় ইয়ামামার যুদ্ধে বহু সংখ্যক হাফেযে কুরআন শহীদ হন, তখন হযরত ওমর (রা) এর পরামর্শে হযরত আবু বকর (রা) এর নির্দেশে বিক্ষিপ্তভাবে লিখিত এবং হাফেযে কুরআনদের বক্ষে সংরক্ষিত আয়াত ও সূরাসমূহকে সংকলন করে একটি পান্ডুলিপিতে বিন্যস্ত করা হয়। এ দায়িত্ব পালন করেন কাতিবে অহী বহু ভাষাবিদ হযরত যায়িদ ইবনে সাবিত (রা)। এ পান্ডুলিপিকে মাসহাফুল ইমাম বলা হয়। হযরত ওসমান (রা) এর খিলাফতের সময় ৩০ হিজরী সনে আযারবাইযান এবং উত্তর পূর্বাঞ্চল বিজয়ের সময় বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষার ফৌজ একত্রিত হয়, তাদের মধ্যে কুরআন পড়ার ক্ষেত্রে বিকৃতি দেখা দেয়। এতে তাওরাত ও ইনজীলের মত কুরআন বিকৃত হওয়ার আশংকা দেখা দেয়। হযরত ওসমান (রা) সাহাবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শক্রমে সিদ্দীকে আকবর (রা) এর সংকলনটি এনে হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত, ইবনে যায়েদ এবং সায়ীদ ইবনে আ'স প্রমুখের দ্বারা এর আটটি কপি করে বিভিন্ন প্রদেশে ও শহরে পাঠিয়ে দেন। এভাবে বিশুদ্ধ কপি দেশে ও শহরে-নগরে প্রচারিত হয়। তা-ই আজ পর্যন্ত চলে আসছে। এটাই "মাসহাফে ওসমানী" নামে পরিচিত।

অহীর প্রকারভেদ

অহী আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ ঃ । ইশারা করা, ইঙ্গিত দেয়া, গোপনে কোন সংবাদ প্রদান করা ইত্যাদি।

শরীয়তের পরিভাষায় ঃ "আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন বাণী নবী-রাসূলগণের প্রতি অবতীর্ণ হওয়াকে অহী বলে।"

অহী সাধারণত দু'প্রকার। যথা ঃ (ক) অহীয়ে মাতলু; (খ) অহীয়ে গায়রে মাতলু। যে অহীর ভাব এবং ভাষা উভয়ই আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল (স)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে উহাকে অহীয়ে মাতলু বলা হয়। পবিত্র কুরআন অহীয়ে মাতলুর অন্তর্ভূক্ত। পক্ষান্তরে যে অহীর ভাব আল্লাহর; কিন্তু ভাষা রাসূল (স)-এর, সে অহীকে অহীয়ে গায়রে মাতলু বলা হয়। হাদীসে রাসূল হচ্ছে অহীয়ে গায়রে মাতলুর অন্তর্ভূক্ত।

আল-কুরআন অবতরণ

পবিত্র কুরআন আল্লাহর বাণী সমষ্টি। ইহা দুনিয়ার অন্য কোন ধর্মীয় গ্রন্থের মত নয় এবং মানব রচিত কোন পুস্তকের মতও নয়। ইহা হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুওয়াতী জিন্দেগীতে প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষাপটে নাযিলকৃত প্রত্যক্ষ অহী। ইহা প্রধানত ঃ দু'পর্যায়ে অবতীর্ণ হয়। **প্রথমত ঃ** "লাওহে মাহফুয' থেকে সম্পূর্ণ কুরআন একই সাথে রামাদান মাসের মহিমান্বিত ক্বদরের রজনীতে "বাইতুল মা'মূরে" অবতীর্ণ হয়।

দ্বিতীয়ত ঃ পৃথিবীর নিকটতম আসমান তথা "বাইতুল মা'মূর" থেকে অল্প অল্প করে ২৩ বছরে প্রয়োজন অনুসারে অবতীর্ণ হয়।

অহী নাযিল হওয়ার পদ্ধতি

অহী বিভিন্ন পদ্ধতিতে অবতীর্ণ হয়। হযরত আয়েশা (রা)-সহ বিভিন্ন সাহাবীগণের বর্ণিত হাদীস দ্বারা অহী অবতীর্ণ হওয়ার নিম্নোক্ত পদ্ধতিসমূহ জানা যায় ঃ

ক. ঘণ্টা ধ্বনির মত অহী নাযিল হত, এ ধরনের অহী নাযিলে রাসূল (স) অত্যধিক কষ্ট অনুভব করতেন।

খ. কোন কোন সময় জিবরাঈল (আ) মানুষের আকৃতিতে মৌখিক ভাষায় অহী নিয়ে হাজির হতেন।

গ. কোন কোন সময় জিবরাঈল (আ) তাঁর প্রকৃত আকৃতিতে অহী নিয়ে হাজির হতেন।

ঘ. কোন কোন সময় জিবরাঈলের মাধ্যম ছাড়াও সরাসরি আল্লাহর সাথে বাক্যালাপের মাধ্যমে অহী আসত।

ঙ. কখনো কখনো রাসূল (স) এর ঘুমন্ত অবস্থায় বা তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় অহী নাযিল হত। উল্লেখ্য যে, রাসূল (স) এর স্বপ্ন সাধারণ লোকের জাগ্রত অবস্থায় বাস্তব ঘটনা অবলোকনের চেয়েও সত্য।

চ. কখনো কখনো রাসূল (স) এর অন্তরে সরাসরি আল্লাহর পক্ষ হতে ভাবের উদয় হত। রাসূল (স) আল্লাহর প্রদত্ত এ ভাবকে তার নিজস্ব ভাষায় ব্যক্ত করতেন। এটাকে হাদীসে কুদসী বলা হয়।

সূরা ও আয়াতের শ্রেণী বিভাগ

অবতীর্ণ হওয়ার দিক দিয়ে বিচার করলে কুরআনের আয়াত ও সূরাসমূহ বার প্রকার। যথা ঃ ১. মাক্কী (মক্কায় অবতীর্ণ) ২. মাদানী (মদীনায় অবতীর্ণ) ৩. হাযরী তথা গৃহাবস্থানকালীন ৪. সফরী (ভ্রমণকালীন) ৫. নাহারী (দিবসকালীন) ৬. লাইলী (রাত্রিকালীন) ৭. সাইফী (গ্রীস্মকালীন) ৮. শিতায়ী (শীতকালীন) ৯. ফিরাশী (শয্যাকালীন) ১০. সববী (অবতীর্ণের কারণ) ১১. আওয়ালী (সর্বপ্রথম অবতীর্ণ) ১২. আখেরী (সর্বশেষ অবতীর্ণ)।

মাক্কী সূরার পরিচয় ঃ যে সব সূরা বা আয়াত হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে, চাই তা মক্কায় অবতীর্ণ হোক বা অন্যত্র অবতীর্ণ হোক তাকে মাক্কী সূরা বা আয়াত বলা হবে।

মাদানী সূরার পরিচয় ঃ ঐসব সূরা ও আয়াত যা হিজরতের পরে অবতীর্ণ হয়েছে, চাই তা মদীনায় অবতীর্ণ হোক বা মদীনার বাইরে অবতীর্ণ হোক তাকে মাদানী সূরা বা মাদানী আয়াত বলা হবে।

হাযরী ঃ ঐ সব সূরা বা আয়াত, যা গৃহে অবস্থানের সময় অবতীর্ণ হয়েছে, এরূপ আয়াত কুরআনে অসংখ্য রয়েছে।

সফরী ঃ ঐসব সূরা বা আয়াত, যা সফর অবস্থায় অবতীর্ণ হয়েছে।

নাহারী ঃ ঐ সব সূরা বা আয়াত, যা দিবাভাগে অবতীর্ণ হয়েছে।

লাইলী ঃ যা রাতে অবতীর্ণ হয়েছে।

সাইফী ঃ যা গ্রীষ্মের সময় অবতীর্ণ হয়েছে।

শিতায়ী ঃ যা শীতের সময় অবতীর্ণ হয়েছে।

ফিরাশী ঃ যা শয্যারত অবস্থায় অবতীর্ণ হয়েছে।

সববী ঃ অবতীর্ণের কারণ, প্রায়শঃ কোন ঘটনা প্রসঙ্গে কোন সূরা বা আয়াত অবতীর্ণ হত। যেমন ঃ ইফ্‌ক এর ঘটনা প্রসঙ্গে অবতারিত আয়াতসমূহ, যাতে হযরত আয়েশা (রা) এর নিষ্কলুষতা বর্ণিত হয়েছে।

প্রথম অবতীর্ণ ঃ এ সম্পর্কে বিশুদ্ধ অভিমত হল, সূরা "আলাক" (ইকরা)-এর প্রথম পাঁচ আয়াত।

শেষ অবতীর্ণ ঃ সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। যেমন ঃ কেউ বলেন, আয়াতে কালালাহ্, কেউ বলেন, আয়াতে রিবা, কেউ বলেন, সূরা নাসর ইত্যাদি।

মাক্কী ও মাদানী সূরার বৈশিষ্ট্য

রাসূল (স)-এর নবী জীবনের দু'টি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম অধ্যায় হচ্ছে হিজরতের পূর্বে নবুয়ত পাওয়ার পর থেকে তের বছরের জিন্দেগী। তাঁর হিজরত করার পর মদীনার দশ বছরের জিন্দেগী হচ্ছে দ্বিতীয় অধ্যায়। এ দু'অধ্যায়ে রাসূল (স)-কে দু'ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হয়। এ পরিবেশ পরিস্থিতিকে সামনে রেখেই পবিত্র কুরআনের আয়াত ও সূরা সমূহ নাযিল হয়। এ দু'অধ্যায়ের সূরাসমূহের দু'ধরনের মৌলিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এ সকল বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নে আলোচনা করা গেল।

মাক্কী সূরার বৈশিষ্ট্য

ক. মাক্কী সূরার সংজ্ঞা ঃ হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবী জীবনে মক্কায় অবস্থানকালে তাঁর হিজরতের সময় পর্যন্ত ১৩ বছরের মধ্যে যে সকল সূরা বা আয়াত অবতীর্ণ হয়, সেগুলোকে মাক্কী সূরা বা মাক্কী আয়াত বলা হয়।

১. মাক্কী সূরাগুলোর অধিকাংশই ছোট, আলোচনা সংক্ষিপ্ত, ভাষা আবেগপূর্ণ, পান্ডিত্যপূর্ণ ও ছন্দাবদ্ধ।

২. মাক্কী সূরাসমূহে সাধারণত নিপীড়িত মানবতার মুক্তি সম্বলিত তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত, জান্নাত, জাহান্নাম, ইবাদাত, কুফর, শিরক, ইত্যাদির বর্ণনা রয়েছে।

৩. আয়াতে সিজদাগুলোর প্রায় সবক'টিই মাক্কী সূরায় রয়েছে।

৪. মাক্কী সূরাগুলোতে বাতিল ধারণার দৃঢ় অস্বীকার জ্ঞাপক শব্দের ব্যবহার সর্বাধিকভাবে পরিলক্ষিত হয়।

৫. সূরা বাকারা ছাড়া যেসব সূরায় হযরত আদম (আ) এবং ইবলিসের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে সেগুলো মাক্কী সূরা।

৬. মাক্কী সূরাগুলোর ভাষার ব্যবহার অলংকারময়, বর্ণনারীতি সুন্দর, বিভিন্ন উপমা, উপস্থাপনা খুবই আকর্ষণীয়।

৭. সাধারণত মাক্কী সূরাগুলোতে মানবতাকে অগ্রাধিকার দিয়ে يَاَيُّهَاالنَّاسُ বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

৮.মাক্কী সূরাসমূহে মূর্তিপূজক মুশরিকদেরকে ইসলামের প্রতিপক্ষ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

মাদানী সূরার বৈশিষ্ট্য

খ. মাদানী সূরার সংজ্ঞা ঃ হযরত মুহাম্মদ (স)-মদীনায় হিজরত করার পর ১০ বছরের জীবনে মদীনায় কিংবা অন্য যে কোন স্থানে যে সকল সূরা ও আয়াত অবতীর্ণ হয়, সেগুলোকে মাদানী সূরা বা মাদানী আয়াত বলা হয়।

১. মাদানী সূরাগুলো অধিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণমূলক।

২. এ সূরাগুলোতে ইসলামী শরীয়তের হুকুম-আহকাম সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে।

৩. এ সূরাসমূহে ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, জাতীয়, আন্তর্জাতিক, অর্থনৈতিক, যুদ্ধ, সন্ধি, দেশরক্ষানীতি ইত্যাদি বিষয়ে সবিস্তারে বিবৃত হয়েছে।

৪. ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার যাকাত, হিবা, উশর ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে মাদানী সূরাসমূহে।

৫. জিহাদ, জিহাদের নিয়ম-কানুন, গনীমত, ফাই, জিযিয়া, খিরাজ ইত্যাদি সম্পর্কে সবিস্তারে বর্ণনা এসেছে মাদানী সূরাসমূহে।

৬. রাসূল (স) এর মাদানী জীবনে মুনাফিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। মুনাফিকদের চারিত্রিক বর্ণনা এসেছে মাদানী সূরাসমূহে।

আল কুরআনের বিষয়বস্তু

কুরআনের মূল বিষয় বস্তু হচ্ছে – মানুষ। (তাফহীম)

আল-কুরআনের মূল লক্ষ্য হল মানবতার ইহলৌকিক শান্তি ও পারলৌকিক মুক্তি। এরই প্রেক্ষিতে আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী তাঁর মুকাদ্দামাতুত তাফসীর গ্রন্থে লিখেছেন- আল কুরআনের বিষয়বস্তু মৌলিক ভাবে ছয়ভাগে বিভক্ত। যথা-

১। আকীদা বিশ্বাস তথা ঈমানের বর্ণনা।

২। ইবাদাতের বর্ণনা, যেমন- নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, জিহাদ, ইতেকাফ ইত্যাদি।

৩। জন্মগত চাহিদাসমূহের বর্ণনা, যেমন-পানাহার, বিয়ে, পোশাক ইত্যাদি।

৪। পারস্পরিক সম্পর্কের বর্ণনা, যেমন-লেন-দেন, বিতর্ক, আমানত, উত্তরাধিকার ইত্যাদি।

৫। শাস্তির বর্ণনা, যেমন-হত্যার শাস্তি, মানহানির শাস্তি, বংশ বিকৃতির শাস্তি, সম্পদ হরণের শাস্তি ইত্যাদি।

৬। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর বর্ণনা। যথা-

(ক) ব্যক্তিগত গুণাবলী তথা-ইলম, বীরত্ব, দান, ক্ষমা, ধৈর্য, ব্যক্তিত্ব, প্রতিশ্রুতি রক্ষা ইত্যাদি।

(খ) সামাজিক গুণাবলী তথা পিতা-মাতার সাথে সদাচারণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা, প্রতিবেশীর হক আদায় করা, অন্যের অধিকার সংরক্ষণ করা ইত্যাদি।

(গ) রাষ্ট্রীয় ও সরকারী দায়িত্বে নিযুক্ত হবার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী।

আল-কুরআন অবতীর্ণের মূল উদ্দেশ্য

প্রত্যেক কাজেরই কোন না কোন উদ্দেশ্য থাকে। উদ্দেশ্য ছাড়া কোন কাজই হয় না। আল্লাহ তা'য়ালা হচ্ছেন মহা কৌশলী। কোন হিকমত ছাড়া

তিনি পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেননি। আল্লামা শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) আল-ফাউযুল কাবীর গ্রন্থে কুরআন অবতীর্ণের নিম্নবর্ণিত মূল উদ্দেশ্য নিহিত বলে বর্ণনা করেছেন ঃ

১.মানবাত্মাকে সুসভ্য করা;

২. ভ্রান্ত আকীদাসমূহ বিদূরিত করা;

৩. বিপর্যস্ত কার্যকলাপ পরিশোধন করা।

পবিত্র কুরআনের সংখ্যাতাত্ত্বিক পরিসংখ্যান

পবিত্র কুরআনে মাক্কী সূরা ৯২টি, মাদানী সূরা ২২টি, সর্বমোট সূরা ১১৪টি, সর্বমোট আয়াত সংখ্যা ৬৬৬৬টি, সর্বমোট শব্দ সংখ্যা ৭৭৪৩৯টি, সর্বমোট অক্ষর সংখ্যা ৩,২৩,৭৬০টি, সর্বমোট বাক্য সংখ্যা ৭৬,৪৩০টি, আল্লাহ শব্দটি আছে ২৫৮৪ বার, যবরের সংখ্যা হল ৪,৫৩,১৪৩ টি, যেরের সংখ্যা ৩৯,৫৮২টি, পেশের সংখ্যা ৮,৮০৪টি, তাশদীদ হল ১,২৭৪টি, মাদ হল ১,৭৭১টি, নুকতা ১০,৫,৬৮৪টি, আদেশ আছে ১০০০আয়াতে, নিষেধ আছে ১০০০ আয়াতে, সুসংবাদ আছে ১০০০ আয়াতে, সতর্কবাণী আছে ১০০০আয়াতে, হালাল হারামের বিধান আছে ৫০০ আয়াতে, পূর্ববর্তী জাতির ইতিহাস আছে ৫০০ আয়াতে, সালাত ও যাকাতের বিধান আছে ১৫০ আয়াতে, তাসবীহর বর্ণনা আছে ১২০ আয়াতে, সর্বমোট পারা ৩০ টি, সর্বমোট রুকু ৫৪০টি, সর্বমোট মনজিল ৭টি, দীর্ঘতম সূরা আল বাকারা, ক্ষুদ্রতম সূরা আল কাওসার, সর্বপ্রথম নাযিলকৃত আয়াত সূরা আলাকের ১ম থেকে ৫ আয়াত, সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াত সূরা মায়েদার ৩৫তম আয়াত, নবী রাসূলগণের নাম আছে ২৫ জনের।

আল-কুরআনের বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. কুরআন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব;

২. কুরআন চিরন্তন ও শাশ্বত গ্রন্থ;

৩. কুরআন নির্ভুল ও অতীব বিশুদ্ধ গ্রন্থ;

৪. কুরআন পরিপূর্ণ জীবন বিধান;

৫. চিরন্তন চ্যালেঞ্জের মুকাবিলায় উত্তীর্ণ গ্রন্থ;

৬. কুরআনের ভাষা ও গুণগত মান অনুপম ও অতুলনীয়;

৭. কুরআন একটি বিপ্লবী দাওয়াত সম্বলিত গ্রন্থ;

৮. মুক্তির এক মাত্র পথ হচ্ছে আল-কুরআন;

৯. কুরআনের বিষয়বস্তু ব্যাপক;

১০. কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব কালোত্তীর্ণ।

দারস পেশ করার নিয়মাবলী

১. বিশুদ্ধ তিলাওয়াত ঃ যিনি দারস দিবেন তাকে বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াত করতে হবে।

২. সরল অনুবাদ ঃ বিশুদ্ধ তিলাওয়াতের পর তার অনুবাদ পেশ করতে হবে।

৩. সূরার নামকরণ ঃ তিলাওয়াতকৃত আয়াত সমূহ যে সূরা থেকে নেওয়া হয়েছে তার নামকরণ এবং যার ওপর ভিত্তি করে নামকরণ করা হয়েছে তার সাথে সূরার কি সম্পর্ক রয়েছে তা তুলে ধরতে হবে।

৪. শানে নুযূল ঃ সংশ্লিষ্ট আয়াত অথবা সূরার শানে নুযূল পেশ করতে হবে।

৫. বিষয়বস্তু ঃ তিলাওয়াতকৃত আয়াত সমূহের অথবা সূরার বিষয়বস্তু পেশ করতে হবে।

৬. ব্যাখ্যা ঃ তিলাওয়াতকৃত আয়াত সমূহের ব্যাখ্যা সঠিকভাবে তুলে ধরতে হবে।

৭. শিক্ষা ঃ দারসের জন্য পেশকৃত আয়াতে কি শিক্ষা রয়েছে তা পয়েন্ট আকারে উল্লেখ করতে হবে।৮

১

কুরআনের সূচনা

১. সূরা আল-ফাতিহা

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ৭, রুকু-১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি।

(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (٢) اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (٣) مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ (٤) اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنَ (٥) اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (٧) غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ.

অর্থ ঃ

১। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্যে, যিনি নিখিল বিশ্বের প্রতিপালক।

২। যিনি দয়াময় পরম দয়ালু।

৩। তিনিই প্রতিদান দিবসের একচ্ছত্র মালিক।

৪। আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং একমাত্র তোমারই সাহায্য চাই।

৫। তুমি আমাদেরকে সহজ-সরল পথ দেখাও।

৬। তাদের পথ, যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ দান করেছ।

৭। যাদের ওপর গযব পড়েনি এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়নি।

শব্দার্থ ঃ اَلْحَمْدُ ঃ সমস্ত প্রশংসা। لِلّٰهِ ঃ আল্লাহর জন্য। رَبٌّ ঃ

প্রতিপালক। اَلْعٰلَمِيْنَ ঃ জগৎসমূহ। اَلرَّحْمٰنُ ঃ দয়াময়। اَلرَّحِيْمِ ঃ পরম দয়ালু, করুনাময়। مٰلِكِ ঃ মালিক, বাদশা, অধিপতি। يَوْمُ ঃ দিন, দিবস। الدِّيْنِ ঃ প্রতিফল, প্রতিদান। اِيَّاكَ ঃ বিশেষ করে আপনারই। نَعْبُدُ ঃ আমরা ইবাদত করি। وَاِيَّاكَ ঃ একমাত্র আপনার কাছে। نَسْتَعِيْنُ ঃ আমরা সাহায্য চাই। اِهْدِنَا ঃ আমাদেরকে প্রদর্শন করুন। اَلصِّرَاطَ ঃ পথ, রাস্তা। اَلْمُسْتَقِيْمَ ঃ সরল সঠিক। اَلَّذِيْنَ ঃ যাদের। اَنْعَمْتَ ঃ আপনি অনুগ্রহ দান করেছেন। عَلَيْهِمْ ঃ তাদেরকে। غَيْرِ ঃ নয়, ব্যতিত অর্থাৎ তাদের পথে নহে। اَلْمَغْضُوْبِ ঃ অভিশপ্ত। وَ ঃ এবং। لاَ ঃ না। اَلضَّالِّيْنَ ঃ পথভ্রষ্ট।

নামকরণ ঃ সূরার নাম আল-ফাতিহা। فَاتِحَةٌ শব্দের অর্থ-সূচনা, ভূমিকা, মুখবন্ধ, খোলা, শুরু করা, উদঘাটন, উপক্রমনিকা ইত্যাদি। যে কোন পুস্তকের ভূমিকার অর্থই হলো পুস্তকখানির মূল আলোচনা অতি সংক্ষেপে প্রারম্ভে উপস্থাপন করা। ভূমিকা পাঠ করেই যেন পাঠক পুস্তক সম্পর্কে একটি মৌলিক ধারণা লাভ করতে পারে। অনুরূপ ভাবে সূরায়ে ফাতিহা আল-কুরআনের ভূমিকা হিসেবে প্রথমেই স্থান লাভ করেছে। এ দিক দিয়ে ফাতিহা নাম যথার্থই বটে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আল-কুরআনে মোট ১১৪টি সূরা রয়েছে। এর মধ্যে ১১২টি সূরার নাম রাখা হয়েছে সূরার মধ্যের কোন একটি শব্দকে বাছাই করে। ব্যতিক্রম মাত্র দু'টো সূরা। সূরা ফাতিহা ও সূরা ইখলাস। বিষয় বস্তুকে কেন্দ্র করে এ দু'টো সূরার নাম করণ করা হয়েছে। সূরায়ে ফাতিহার অন্তর্নিহিত ভাবধারার অনুকূলে এর আরো কতগুলি নাম রয়েছে। আল্লামা জালাল উদ্দীন সূয়ূতী (র) তাঁর اَلاِتْقَانُ فِىْ عُلُوْمِ الْقُرْاٰنِ গ্রন্থে পঁচিশটি নামের উল্লেখ করেছেন। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো ঃ

১। فَاتِحَةُ الْكِتَابِ (ফাতিহাতুল কিতাব) ঃ কিতাবের মুখবন্ধ। কারণ, ভূমিকা হিসেবে এ সূরাটি কুরআনের প্রথমেই স্থান লাভ করেছে। আর শুরুতেই এ সূরাটি পড়ার জন্য খোলা হয়। পূর্ণাঙ্গ সূরা হিসেবে সর্ব প্রথম

এটি নাযিল হয়েছে। নামাযেও সর্ব প্রথম এ সূরা পড়া হয়। মাসহাফে ওসমানীতেও সর্ব প্রথম এ সূরাটি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

২। أُمُّ الْكِتَابِ (উম্মুল কিতাব) ঃ গ্রন্থজননী বা গ্রন্থের নির্যাস। এ সূরায় আল-কুরআনের মূল বিষয় সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ কুরআন হলো এ সূরাটির বিস্তারিত বিবরণ।

৩। أُمُّ الْقُرْآنِ (উম্মুল কুরআন) ঃ কুরআনের জননী, কুরআনের মূল। মা যেমন সন্তানের মূল, সূরা ফাতিহাও তেমনি কুরআনের মূল। পবিত্র কুরআনের মূলতত্ত্ব এ সূরায় আলোচনা করা হয়েছে।

৪। فَاتِحَةُ الْقُرْآنِ (ফাতিহাতুল কুরআন) ঃ এ সূরা পবিত্র কুরআনের সর্বপ্রথমে লিপিবদ্ধ হওয়ার কারণে একে ফাতিহাতুল কুরআন বা কুরআনের সূচনা বলা হয়।

৫। اَلشِّفَاءُ (আশ-শিফা) ঃ আরোগ্য লাভের উপায়। রাসূল (স) বলেন, সূরা ফাতিহা সর্বপ্রকার বিষক্রিয়ার শিফা। কেননা, এর মর্মার্থসহ তিলাওয়াত করলে মানসিক ও দৈহিক রোগ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে।

৬। اَلرُّقْيَةُ (আর রুকিয়্যাহ) ঃ ঝাড়-ফু দেয়ার সুরা। এ সূরা দ্বারা ঝাড়-ফু দেয়া যায়। তাতে রোগ থেকে মুক্তি লাভ করা যায় ও যন্ত্রণা দূর হয়।

৭। اَسَاسُ الْقُرْآنِ (আসাসুল কুরআন) ঃ কুরআনের ভিত্তি। ইহা কুরআনের মৌলিক অংশ। এর ওপর ভিত্তি করেই পবিত্র কুরআনের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হয়েছে ।

৮। اَلْوَاقِيَةُ (আল-ওয়াকিয়া) ঃ রক্ষক । এ সূরাই মানুষকে সৎপথ দেখাতে পারে এবং বিপথ থেকে রক্ষা করতে পারে।

৯। اَلْكَافِيَةُ (আল-কাফিয়া) ঃ প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট। এতে মানুষের রীতি-নীতি থেকে শুরু করে সকল কর্মনীতি অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। যা মানুষের জীবনের জন্য যথেষ্ট।

১০। اَلصَّلٰوةُ (আস্‌সালাত) সালাতে অবশ্য পঠনীয় সূরা। এ সূরা ছাড়া ফরয, সুন্নাত ও নফল কোন নামাযই পূর্ণাঙ্গভাবে পড়া যায় না।

১১। اَلْكَنْزُ (আল-কানয) ঃ খনি, আকর, সর্বজ্ঞানাধার। কেননা, এতে সুক্ষ্মভাবে যাবতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

১২। اَلْوَافِيَةُ (আল-ওয়াফিয়া) ঃ পূর্ণাঙ্গ সূরা। কেননা, এর মধ্যে জীবনের সকল দিক ও বিভাগের নির্দেশনা রয়েছে।

১৩। اَلْحَمْدُ (আল-হামদ) ঃ প্রশংসা সূচক সূরা। কেননা, এ সূরাটিতে আল্লাহর প্রশংসা করা হয়েছে এবং সূচনা আল-হামদু দ্বারা করা হয়েছে।

১৪। اَلشُّكْرُ (আশ-শোকর) ঃ শোকর আদায় করার সূরা। এ সূরার মাধ্যমে আল্লাহর সকল নে'য়ামত সমূহের শোকর আদায় করা হয়।

১৫। سُوْرَةُ الدُّعَاءِ (সূরাতুত-দু'আ) ঃ দু'আ করার সূরা। এ সূরা দ্বারা আল্লাহর কাছে দু'আ করা হয়।

১৬। تَعْلِيْمُ الْمَسْئَلَةِ (তা'লীমুল মাসয়ালা) ঃ প্রার্থনা করার সূরা। এ সূরায় প্রার্থনা করার পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

১৭। اَلْمَثَانِىْ (আল-মাছানী) ঃ যা বার বার পড়া হয়। যেমন নামাযে পড়া হয়। কুরআন তেলাওয়াতের শুরুতে পড়া হয়।

১৮। اَلشَّافِيَةُ (আশ-শাফিয়া) বহু রোগ মুক্তির কারণ। এ সূরার মাধ্যমে রোগ থেকে মুক্তি লাভ করা যায়।

১৯। سَبْعُ الْمَثَانِىْ (সাবউল মাছানী) ঃ নিত্যপঠিত বাণী সপ্তক। যা প্রত্যহ মানুষ নামাযে পুনঃ পুনঃ পাঠ করে থাকে।

২০। قُرْاٰنُ الْعَظِيْمِ (কুরআনুল আজীম) ঃ মহাগ্রন্থ। এমন সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ যা জ্ঞান ভান্ডার এবং যা সর্বদা পাঠ করা হয়।

২১। اَدْعِيَاءُ الْمَسْئَلَةِ (আদইয়াউল মাসয়া'লা) ঃ যাচনার সূরা। কেননা, এতে আল্লাহর প্রতি বান্দার বিনয় প্রকাশের মুখ্য বিষয়ের প্রার্থনা রয়েছে।

২২। سُوْرَةُ الْمُنَاجَاةِ (সুরাতুল-মুনাজাত) ঃ প্রার্থনার সূরা। কেননা, এ সূরায় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার প্রয়োজনীয় ভাষা বিদ্যমান।

২৩। سُوْرَةُ اللاَّزِمَةِ (সূরাতুল-লাযেমাহ) অধিক আবশ্যকীয় সূরা।

২৪। سُوْرَةُ النُّـوْرُ (সুরাতুন-নূর) কেননা, এ সূরাটি হেদায়েত লাভে ধন্য হওয়া ও মানসিক পরিছন্নতার জন্য আলোকবর্তিকা স্বরূপ।

২৫। سُوْرَةُ التَّفْوِيْض (সূরাতুত-তাফবীয) আত্মসমর্পণের সূরা। কেননা, এ সূরার মর্মকথা হলো মানুষ আল্লাহর গোলাম হিসেবে তার কাছে নিজেকে সোপর্দ করে দেয়।

শানে নুযূল ঃ নবুয়াতের প্রাথমিক অবস্থায় রাসূল (স)-এর উপর সূরায়ে 'আলাক', 'মুদ্দাস্‌সির' ও 'মুয্‌যাম্মিল'-এর কয়েকটি আয়াত অবতীর্ণ হয়। অতঃপর বেশ কিছুদিন ওহী না আসায় তিনি অস্থির হয়ে পড়েন। রাসূল (স) একদিন হেরা গুহা থেকে নির্জন প্রান্তর দিয়ে মক্কার দিকে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে "ইয়া মুহাম্মদ" ডাক শুনতে পান । সে মুহূর্তেই হযরত জিব্রাঈল (আঃ) তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ আসমান ও যমীনের মধ্যে সর্বোত্তম আমল কোনটি বলে দিব কি? তখন সূরা ফাতিহা সম্পূর্ণ অবতীর্ণ হয়। নির্ভরযোগ্য হাদীস হতে জানা যায় যে, রাসূল (স)-এর ওপর সূরা ফাতিহাই সর্ব প্রথম পূর্ণাঙ্গ সূরা হিসেবে নাযিল হয়। ইহা মক্কী সূরা। এ সূরাটি ২বার অবতীর্ণ হয়। হিজরতের পূর্বে একবার মক্কায় এবং হিজরতের পর দ্বিতীয়বার মদিনায়।

সূরা ফাতিহার ফযীলত

সূরা ফাতিহা পবিত্র কুরআনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূরা। এ সূরা দ্বারাই পবিত্র কুরআন শুরু করা হয়েছে এবং এ সূরা দিয়েই পবিত্র নামায শুরু করা হয়। পূর্ণাঙ্গ সূরা হিসেবে এটিই সর্ব প্রথম নাযিল হয়। সূরা ফাতিহা পবিত্র কুরআনের সার সংক্ষেপ। আর কুরআনের অবশিষ্ট সূরাগুলো সূরা ফাতিহারই ব্যাখ্যা বিশেষ। তাই এ সূরাকে উম্মুল কুরআন, উম্মুল কিতাব ও কুরআনুল আযীম বলা হয়।

হাদীসের আলোকে সংক্ষেপে এ সূরার ফযীলত নিম্নে তুলে ধরা হলো ঃ

হযরত আবু সাঈদ (রা) বলেন ঃ একদিন আমার নামাযরত অবস্থায় নবী করীম (স) আমাকে ডাকলেন। আমি তাঁর ডাকে সাড়া না দিয়ে নামায

আদায় করতে ছিলাম। নামায শেষ করে তাঁর নিকট উপস্থিত হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ডাকার সঙ্গে সঙ্গে আমার নিকট হাজির হলে না কেন? আমি আরজ করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি নামাযরত অবস্থায় ছিলাম। তিনি প্রশ্ন করলেন আল্লাহ তা'য়ালা কি বলেননি?

يَاأَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَايُحْيِيْكُمْ.

"হে মু'মিনগণ! আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স) যখন তোমাদিগকে কোন কিছুর দিকে আহ্বান করবেন তখন তোমরা তাঁর ডাকে সাড়া দিবে। কেননা, এর মধ্যে রয়েছে তোমাদের জীবন।" (সূরা আনফাল ঃ ২৪)

আমি চুপ করে থাকলাম। অতঃপর তিনি বললেন, মসজিদ থেকে তোমার বের হওয়ার পূর্বেই আমি তোমাকে অবশ্যই কুরআন মজিদের শ্রেষ্ঠতম সূরা জানিয়ে দেব। এ বলে তিনি আমার হাত ধরে মসজিদ থেকে বের হওয়ার আয়োজন করলেন। আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! (স) আপনি তো বলেছেন কুরআনের শ্রেষ্ঠতম সূরা জানিয়ে দিবেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ উহা হচ্ছে ঃ "আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।" (মুসনাদে আহমদ)

রাসূল (স)-কে ফেরেশ্তার মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁকে দু'টি উজ্জ্বল নক্ষত্র দান করা হয়েছে, যা তাঁর পূর্ববর্তী কোন নবীকে দেয়া হয়নি। উহার একটি হচ্ছে সূরা ফাতিহা আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে সূরা বাকারার শেষ কয়টি আয়াত। (নাসায়ী ঃ ১ম খন্ড পৃঃ ১৪৫, তাফসীরে খাযিন)

রাসূল (স) বলেন ঃ এ সূরার তুল্য তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে কোন সূরা নেই। পবিত্র কুরআন সকল আসমানী কিতাবের মূল। আর সূরা ফাতিহা হচ্ছে কুরআনের মূল। যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করল সে সমগ্র তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল ও কুরআন পাঠ করল।

রাসূল (স) বলেন ঃ فِيْ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ شِفَاءٌ مِّنْ كُلِّ دَاءٍ - সূরা ফাতিহার মধ্যে সকল রোগের আরোগ্য রয়েছে। (দারেমী, বায়হাকী)

সূরা ফাতিহার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

অনুবাদ

"সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্যে, যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক।"

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

সূরার শুরুতেই 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে আল্লাহর প্রশংসা করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্যে অন্য কারো জন্যে নয়। অতপর আল্লাহর পরিচয় দেয়া হয়েছে এভাবে যে, যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। সকল প্রকার কৃতজ্ঞতা এবং প্রশংসা পাওয়ার অধিকারী তিনিই।

اَلْحَمْدُ শব্দের বিশ্লেষণ ঃ 'হামদ' শব্দটি বাবে سَمِعَ-يَسْمَعُ এর মাসদার। অর্থ প্রশংসা। শরীয়তের পরিভাষায় ঃ অনুগ্রহ প্রাপ্ত হওয়া না হওয়া উভয় অবস্থায় সম্মানার্থে সর্বোত্তমভাবে কারো প্রশংসা করাকে 'আলহামদু' বলে। আরবীতে প্রশংসার আর একটি শব্দ হচ্ছে 'মাদহুন'। আর মাদহুন অর্থ হচ্ছে ভূয়সী প্রশংসা। কোন ব্যক্তির মধ্যে অবস্থিত গুণাবলীর সাধারণভাবে যে প্রশংসা করা হয় তা মাদহুন শব্দ দিয়ে প্রকাশ করা হয়। যেমন ভাল লেখক, ভাল পন্ডিত, ভাল মানুষ ইত্যাদি। বিশেষ প্রশংসা করতে 'হামদুন' শব্দ ব্যবহৃত হবে। যিনি শুধু এ পৃথিবীই নহেন, গোটা বিশ্ব জগতের মালিক, যিনি সমস্ত জীব-জন্তুর রিযিকের ব্যবস্থা করে যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করে প্রতিপালন করেন তার ব্যাপারেই শুধু 'হামদুন' শব্দ ব্যবহৃত হবে। অতএব 'আলহামদু' ইহা মৌলিক প্রশংসা যা আল্লাহর শানে ব্যবহৃত হবে। আর اَلْحَمْدُ শব্দের শুরুতে যে ال রয়েছে এ আলিফ, লামকে আরবী ব্যাকরণের পরিভাষায় আলিফ লামে اِسْتِغْرَاقِيْ বলে। তাই আলহামদু' অর্থ সকল শ্রেণীর সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য নির্দিষ্ট। যিনি সকল সৃষ্টি জগতের একমাত্র প্রতিপালক। সকল প্রকার কৃতজ্ঞতা এবং প্রশংসা পাওয়ার অধিকারী তিনিই। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ وَلَكَ الْمُلْكُ كُلُّهُ.

"হে প্রভু! তোমারই সকল প্রশংসা এবং সমগ্র সাম্রাজ্য তোমারই।" (তাফসীরে ইবনে কাসীর ঃ ১৬৫)

اَللّٰهُ শব্দের বিশ্লেষণ ঃ اَللّٰهُ শব্দের মূল ধাতু اِلٰهٌ ইলাহ'। اِلٰهٌ -এর প্রথম অক্ষর أ (হামযা) বিলুপ্ত করে তদস্থলে اَل যোগ করায় اَللّٰهُ হয়েছে। اِلٰهٌ 'ইলাহ' অর্থ উপাস্য। যার উপাসনা করা হয়। 'ইলাহ' শব্দের মধ্যে নিম্নলিখিত অর্থের সমাবেশ রয়েছে ঃ

১. এমন এক শক্তি যার নিকট হতবুদ্ধি হয়ে কেউ আশ্রয় প্রার্থনা করে;

২. যার শক্তি ও মোহনীয়তা দেখে মানুষ অবাক হয়ে যায়;

৩. যিনি সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী এবং অদৃশ্য;

৪. যার সর্বত্র প্রভূত্ব এবং সার্বভৌমত্ব গ্রহণ করা যায়;

৫. যাঁর প্রদত্ত আইন-কানুন ও নির্দেশাবলী অনুসরণ করা যায়। (তাফসীর আল-ফাতিহা ঃ ৪৯)

رَبٌّ শব্দের বিশ্লেষণ ঃ এখানে رَبٌّ 'রব' শব্দ রয়েছে। কুরআনে এর অর্থ এবং মর্ম অত্যন্ত ব্যাপক। اَلرَّبُّ অর্থ হচ্ছে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী সত্তা, প্রভু, প্রতিপালক, ক্রমোন্নতি বিধায়ক ও কর্মবিকাশ সাধক। তাই এ দিক দিয়ে আরবী ভাষায় এর তিনটি অর্থ রয়েছে। যথা-এক. মালিক ও প্রভু; দুই. অভিভাবক, প্রতিপালনকারী, রক্ষণাবেক্ষণকারী ও সংরক্ষণকারী; তিন. সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, শাসনকর্তা, পরিচালক ও সংগঠক। যে শক্তির মধ্যে একসঙ্গে এতসব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আনজাম দেয়ার ক্ষমতা ও গুণ আছে তিনি হচ্ছেন- رَبٌّ

'রব' হলো এমন ক্ষমতাধর সত্তা, যখন যার যা প্রয়োজন তখন তিনি তা দিয়ে থাকেন। যিনি প্রতিপালক তিনিই আদিতে স্রষ্টা, পরে সংরক্ষক ও বিবর্ধক। যিনি তার অধীনস্থ প্রতিটি জিনিসের লালন-পালন করেন ও দেখা-শুনা করেন, তদারকী থেকে সংশোধন, পরিমার্জন ও রক্ষণাবেক্ষণের সব ধরনের ব্যবস্থা পাকা-পাকি করেন (ফি যিলালিল কুরআন)

اَلْعٰلَمِيْنَ শব্দের বিশ্লেষণ ঃ 'আলামীন' শব্দটি 'আলম' শব্দের বহুবচন। 'আলম' দ্বারা শুধু এ পৃথিবী বুঝায় না। আমাদের বাসযোগ্য এ ভূমন্ডল একটি আলম। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি একেকটি 'আলম'। 'আলম' শব্দের অর্থ এমন নিদর্শন যা দ্বারা কোন সত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। মহাবিশ্বের ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রতিটি সৃষ্টির দ্বারা যেহেতু আল্লাহর অবিনশ্বর পরিচয় পাওয়া যায় তাই প্রতিটি সৃষ্টিকে এক একটি 'আলম' বলা হয়। 'আলম' শব্দ দ্বারা কখনো কখনো জাতি বুঝানো হয়। যেমন-عَالَمُ الْاِنْسَانِ মানব জাতি, عَـالَمُ الْجِـنِّ জিন জাতি, عَالَمُ الْمَلاَئِكِ ফেরেশতাকূল ইত্যাদি। যেহেতু প্রতিটি জাতির সৃষ্টি আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বের নিদর্শন বহন করে; এজন্য এগুলোকে 'আলম' বলে। যে অর্থই গ্রহণ করা হোক সকলেরই প্রতিপালক, রক্ষক, সৃষ্টিকর্তা হলেন আল্লাহ। (সূরা ফাতিহা তাফসীরে কাশশাফ)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন ঃ এ পৃথিবীর ন্যায় চল্লিশ হাজার জগৎ আছে।

কেহ কেহ মনে করেন ঃ আলমের সংখ্যা আঠার হাজার। তার মধ্যে পৃথিবী একটি এবং আলমে মিছাল, আলমে বারযাখ ইত্যাদি।

হযরত মাকাতিল (রা) বলেন ঃ জগতের সংখ্যা আশি হাজার (কুরতুবী)

ইমাম রাযী বলেন ঃ সৌর জগতের বাইরে আরো সীমাহীন জগৎ রয়েছে। কাজেই 'আলাম' দ্বারা সে জগতকে বুঝানো হয়েছে। (তাফসীরে কবীর)

اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অনুবাদ

"যিনি দয়াময় পরম দয়ালু।"

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

প্রথম আয়াতে আল্লাহর পরিচয় তুলে ধরেছেন এবং এ আয়াতে তাঁর গুণাবলীর কথা বর্ণনা করেছেন এভাবে যে, যিনি দয়াময় পরম দয়ালু। তাঁর দয়ায়ই সবাই বেঁচে আছে। তিনি পৃথিবীতে সকলের প্রতি করুণাময় ও

অনুগ্রহশীল, আর পরকালে মু'মিনদের প্রতি মেহেরবান ও করুনা প্রদর্শনকারী।

اَلرَّحْمٰنُ ও اَلرَّحِيْمُ শব্দের মধ্যে পার্থক্য ঃ اَلرَّحْمٰنُ ও اَلرَّحِيْمُ দু'টি শব্দ رَحْمٌ ধাতু থেকে নির্গত। 'রহমান' শব্দটি আল্লাহর জন্য খাস, অন্য কারো জন্য ব্যবহার করা হয় না এবং এর স্ত্রী লিঙ্গও হয়না। বাংলা ভাষায় এর অর্থ হয় দয়াময়। রাহীম শব্দের অর্থ বিশেষ দয়ালু। আল্লাহর প্রশংসায় 'রহমান' আবার 'রাহীম' বলার মধ্যে এই নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত রয়েছে। আরবী ভায়ায় 'রহমান' একটি বিপুল আধিক্যবোধক শব্দ। কিন্তু সৃষ্টির প্রতি আল্লাহর রহমত ও মেহেরবাণী এত বেশী ও ব্যাপক এবং এত সীমাসংখ্যাহীন যে, তা বর্ণনা করার জন্য সবচেয়ে বেশী ও বড় আধিক্যবোধক শব্দ ব্যাবহার করার পরও মন ভরে না। তাই তাঁর আধিক্য প্রকাশের হক আদায় করার জন্য আবার রাহীম শব্দটিও বলা হয়েছে। আল্লাহর দয়া দু'প্রকার। যথা-

এক প্রকার দয়া যা সকলে পাচ্ছে বা ভোগ করছে। এ দয়া হতে কাফির, নাস্তিক অন্যান্য কাউকেই বঞ্চিত করা হয় না। এ প্রকারের দয়া চিরস্থায়ী থাকে না। শুধু ইহ জগতের সাথে সম্পৃক্ত।

দ্বিতীয় প্রকারের দয়া আল্লাহর খাস দয়া, যা ইহলোকে ও পরলোকে চিরস্থায়ী হবে। এ প্রকারের দয়া শুধু তাঁরাই পাবে যারা আল্লাহর প্রেরিত পুরুষের আনুগত্য স্বীকার করবে এবং তাদের আদেশ নিষেধ মানবে, তারাই হলো মুসলিম। এরাই পরলোকে মুক্তি পাবে ও জান্নাত লাভ করবে। এজন্যই বলা হয় আল্লাহ তা'আলা সকলের জন্য দয়ালু, অনুগ্রহ দাতা, বিশেষভাবে মুসলমানদের প্রতি পরম দয়াশীল, অনুগ্রহশীল ও স্থায়ী নি'আমত দাতা।

اَلرَّحْمٰنُ: هُوَ ذُوْ الرَّحْمَةِ الشَّامِلَةِ بِجَمِيْعِ الْخَلاَئِقِ فِىْ الدُّنْيَا وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ فِىالْاٰخِرَةِ.

"রহমান হলেন তিনি যিনি এমন রহমতের অধিকারী। যার রহমত পৃথিবীর

সমস্ত সৃষ্টিকেই আবৃত্ত করেছে এবং উক্ত রহমত শুধু মু'মিনগনই আখেরাতে লাভ করবেন।"

مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ.

অনুবাদ

"তিনিই প্রতিদান দিবসের একচ্ছত্র মালিক।"

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

মহা উত্থানের দিন, প্রতিদান দিবসে তাঁর কর্তৃত্ব ও আধিপত্য ছাড়া আর কারো কর্তৃত্ব চলবে না।

مَـالِكٌ অর্থ ঃ مَـالِكٌ একবচন, বহুবচনে مُلُوْكٌ - مَالِكُوْنَ অর্থ ঃ মনিব, অধিকর্তা, রাজা, বাদশা, সমস্ত কর্তত্বের অধিকারী, একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী, প্রতিদান দিবসের স্বত্বাধিকারী, এমন বাদশা যিনি সাধারণভাবে সকল প্রজাবৃন্দের সকল কাজ-কর্ম তদারকী করেন। এবং উক্ত কাজ কর্মের হিসাব-নিকাশ নিয়ে প্রতিদান প্রদান করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন। مَلِكٌ শব্দটি مُلْكٌ শব্দ থেকে আর مَـالِكٌ শব্দ مَلِكٌ থেকে উৎপত্তি হয়েছে। আর مَلْكٌ এর তুলনায় مَلِكٌ ঃ শব্দটি আম। এক্ষেত্রে عَامٌ ঃ নেয়া উত্তম। সাধারণত এর দ্বারা গঠিত শব্দের মৌলিক অর্থ হয়ঃ

১. কোন বস্তুর ওপর ক্ষমতাবান হওয়া;

২. অধিকার;

৩. মজবুত;

৪. এমন পদ্ধতি; যার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হয়।

يَـوْمٌ এর অর্থ ঃ সাধারণ ব্যবহারে يَوْمٌ বলে এক সূর্যোদয় হতে পরবর্তী সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত সময়কে। আবার আরবী ভাষায় يَوْمٌ শব্দটি সাধারণ সময় বা কাল অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আবার সুবিশাল সময়কেও يَوْمٌ বলা হয়। এখানে সুদীর্ঘ সময় অর্থই সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ কর্মফলের সময়টা দ্বিতীয়বার উত্থান-বিষাণে ফুঁক দেয়ার সময় হতে আরম্ভ করে মানব সৃষ্টির

আদি হতে মহাপ্রলয় পর্যন্ত সমস্ত লোকের হিসাব-নিকাশ হয়ে জান্নাতে বা জাহান্নামে প্রবেশ করার হুকুম পর্যন্ত স্থায়ী হবে।

সাধারণ ব্যবহারে দীন অর্থ-জীবন ব্যবস্থা, কর্মফল, আইন ইত্যাদি। এখানে কর্মফল অর্থটিই সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়-আল্লাহ তা'আলা কর্মফল দিবস তথা বিচার দিনের মালিক। আল্লাহ শুধু রহমান-রাহীমই নন, সুবিচারকও বটে। তিনি এমন অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিচারক ও কর্তৃত্ব সম্পন্ন যে, সে দিন তাঁর অনুমতি ব্যতীত আর কারো একটি বাক্যও উচ্চারণ করার ক্ষমতা থাকবে না, এটাই হবে শেষ বিচার দিবস। ঐদিনের ফয়সালাই জান্নাত-জাহান্নামের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنَ.

অনুবাদ

"আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই সাহায্য চাই।"

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

আল্লাহকে পরম আত্মীয় জ্ঞানে বান্দা তাঁর সমীপে আত্মনিবেদন করে বলছে, প্রভু হে! আমরা কেবল তোমারই ইবাদত ও দাসত্ব করি এবং কেবল তোমারই সাহায্য চাই।

اَلْعِبَادَةُ এর অর্থ : اَلْعِبَادَةُ এর মূল ধাতু 'عَبْدٌ' আবদ বলা হয় দাস বা গোলামকে। এটারই ক্রিয়া মূল হল 'عِبَادَتٌ' ইবাদত। অর্থাৎ, বন্দেগী বা দাসত্ব করা। একথাটির মর্ম নিম্নরূপ

১. যে বন্দেগী স্বীকার করে সে বান্দা ছাড়া আর কিছু নয়। বান্দা হওয়া ও বান্দা হয়ে থাকাই তার সঠিক মর্যাদা।

২. সৃষ্টির মূলে এমন এক সৃষ্টিকর্তা আছে যাঁর বন্দেগী করা অপরিহার্য।

৩. যাঁর বন্দেগী করা হবে, তাঁর তরফ হতে নিয়ম ও আইন-বিধান নাযিল হলে যে ব্যক্তি বন্দেগী করবে সে তাঁকে স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিধানকেও পুরোপুরি মেনে নিতে হবে।

৪. কাউকে মা'বুদ বলে স্বীকার করা এবং তাঁর দেয়া আইন-কানুন পালন করে চলার একটি অনিবার্য ফলাফল রয়েছে, যে ফলাফলের দিকে লক্ষ্য রেখেই এ বন্দেগীর কাজ করা হবে।

মানুষের প্রধানত কর্তব্য হচ্ছে আল্লাহর ইবাদত করা। মূলত আল্লাহ এজন্যই মানবকূলের সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু দুর্বল মানসিকতা সম্পন্ন মানবের পক্ষে এ কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করে চলা সম্ভবপর হয়ে উঠে না। তাই ইবাদতের অঙ্গীকারের সঙ্গে সঙ্গে বান্দার ভাষায় ব্যক্ত করা হচ্ছে– 'হে আমাদের পরোয়ারদিগার! একর্তব্য পালনের জন্য তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করছি। এতে আল্লাহর পক্ষ হতে এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, বান্দা ইবাদতের জন্য দৃঢ় সংকল্প হোক, নিজের সাধ্যমত এ কর্তব্য পালন করে যাক, আর আমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করতে থাকুক, আমি তাকে শক্তি-সামর্থ্য প্রদান করব।

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ.

অনুবাদ

"তুমি আমাদেরকে সহজ-সরল পথ দেখাও।"

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

বান্দা তাঁর কাছে আরো প্রার্থনা করছে যে, হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে সরল ও সঠিক পথে পরিচালিত কর।

هِدَايَتْ শব্দের ব্যবহারিক অর্থ পথ প্রদর্শন করা, অথবা পথের শেষ মনযিল পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া। মানুষকে এ হিদায়াত চারটি দিক দিয়ে দেয়া হয়েছে।

প্রথমতঃ স্বভাবজাত জ্ঞান হতে কাজের পথ জেনে নেয়ার সুব্যবস্থা গ্রহণ করা, দ্বিতীয়তঃ মানুষের অর্ন্তনিহিত চেতনা ইন্দ্রিয় শক্তির সাহায্যে জীবন পথের জ্ঞান অর্জন করা। তৃতীয়তঃ স্বাভাবিক জ্ঞান-বুদ্ধির পথ নির্দেশ লাভ করা এবং চতুর্থতঃ দীন হতে পথ নির্দেশনা লাভ করা। প্রথমোক্ত তিন ধরনের হিদায়াত সাধারণভাবে সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে নিহিত রয়েছে, কিন্তু

স্বভাবজাত হিদায়াত দ্বারা মানুষের জীবনের ব্যাপক, জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনসমূহ কিছুতেই পূরণ হতে পারে না। জীবনকে সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত করতে হলে দীন ভিত্তিক হিদায়াত একান্ত আবশ্যক যা মানুষের কাছে আসে আল্লাহর পক্ষ হতে অহীর মাধ্যমে এবং যা বাস্তবায়ন করেন রাসূলগণ।

اَلصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ঃ সিরাতুল মুস্তাকীম এর বিভিন্ন অর্থ রয়েছে । যথা- ১. কিতাবুল্লাহ; ২. ইসলাম; ৩. আবু আলিয়ার মতে, মুহাম্মদ (স). আবুবকর ও ওমর (রা)-এর আদর্শ উদ্দেশ্য; ৪. সাহল বলেন ঃ সুন্নতে রাসূল ও সুন্নতে সাহাবা উদ্দেশ্য, ৫. ইমাম মুযানী বলেন ঃ রাসূলের তরীকাকে সিরাতে মুস্তাকীম বলা হয়েছে এবং ৬. আল্লামা যামাখশারী বলেন ঃ সত্যপথ ও সত্য দীন ইসলামকে বুঝানো হয়েছে। যেহেতু ইসলাম সহজ-সরল পথ তথা নির্ভেজাল জীবন ব্যবস্থা, সেহেতু এখানে ইসলামকেই সিরাতুল মুস্তাকীম বলা হয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে যিহাক বর্ণনা করে বলেন ঃ ইয়্যাকা 'না'বুদু' এর তাৎপর্য হচ্ছে ঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা একমাত্র তোমারই দাসত্ব করি।, একমাত্র তোমাকেই ভয় করি এবং একমাত্র তোমারই কাছে রহমত পেতে আশাকরি। আমরা অন্য কারো ইবাদত করি না, না অন্য কাউকে ভয় করি। আর না অন্য কারো নিকট রহমত পাওয়ার আশা করি। "অইয়্যাকা নাস্তায়ীন" এর তাৎপর্য হলো এই যে, "আমরা তোমারই ইবাদতসহ সকল কাজেই তোমাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। (আল-হাদীস)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সামিত (রা) হতে বর্ণিত। রাসূল (স) বলেন ঃ "যে ব্যক্তি সালাতে ফাতিহাতুল কিতাব পাঠ করে না, তার সালাত কবুল হয় না। (বুখারী-মুসলিম)

তাই সূরা ফাতিহা একটি দু'আ, এর মাধ্যমে যা প্রার্থনা করা হয় তাই কবুল করা হয়।

হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন ঃ হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত হয়েছে ঃ

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ আমি আমার ও আমার বান্দার মধ্যে সালাতকে (ফাতিহাকে) আধা-আধি ভাগ করে নিয়েছি। ইহার মধ্যে বান্দা যা চায় সে তা পাবে। বান্দা যখন বলেন ঃ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. "আল্লাহ তা'আলা তখন বলেন ঃ আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে।" সে যখন বলে ঃ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ আল্লাহ তা'আলা তখন বলেন ঃ আমার বান্দা আমার গুণ বর্ণনা করেছে, সে যখন বলে ঃ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ. আল্লাহ তা'আলা তখন বলেন ঃ আমার বান্দা আমার মাহাত্ম বর্ণনা করেছে। সে যখন বলে ঃ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنَ. আল্লাহ তা'আলা তখন বলেন ঃ ইহা আমার ও আমার বান্দার মধ্যে বিভক্ত রয়েছে। আমার বান্দা যা চাবে সে তা পাবে। সে যখন বলে ঃ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ. صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ. غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّآلِّيْنَ.

তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ ইহা আমার বান্দার প্রাপ্য অংশ। অনন্তর সে যা চেয়েছে তা সে পাবে। (মুসলিম)

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ.

অনুবাদ

"তাদের পথ, যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ দান করেছ।"

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তাদের পথে আমাদেরকে পরিচালিত কর, তোমার প্রিয় বান্দাদের থেকে যাদেরকে তুমি নি'আমত দান করেছ।

اَلَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ঃ যাদের আল্লাহ তা'য়ালা নি'আমত দান করেছেন তার বর্ণনা আল্লাহ তা'আলা নিজেই পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন।

اَلَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصّٰلِحِيْنَ.

অর্থাৎ আল্লাহ যাদেরকে পুরস্কৃত করেছেন তারা হলেন, নবীগণ,

সিদ্দীকগণ, শহীদগণ এবং সৎকর্মশীলগণ। এরাই আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্তদের অন্তর্গত।

غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ.

অনুবাদ

"যাদের ওপর গযব পড়েনি এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়নি।"

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তাদের পথে নয়, যারা স্বীয় বাড়াবাড়িগত অসাদাচরণের কারণে অভিশপ্ত হয়েছে এবং যারা স্বীয় সংকীর্ণতাগত অন্যায় আচরণে পথভ্রষ্ট হয়েছে। অর্থাৎ অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্টদের পথে আমাদেরকে পরিচালিত করো না।

اَلْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ. ঃ দ্বারা ইয়াহুদীদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেন ঃ وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ অর্থাৎ "আল্লাহ তাদের ওপর গযব এবং অভিশাপ অবতরণ করেছেন।" **اَلضَّالِّيْنَ** দ্বারা নাসারা তথা খ্রিষ্টানদেরকে বুঝানো হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন ঃ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَاَضَلُّوْا كَثِيْرًا অর্থাৎ "তারা নিজেরা পথ ভ্রষ্ট হয়েছে এবং অনেক লোককে ভ্রষ্ট করেছে।" অথবা مَغْضُوْبِ এবং ضَالِّيْنَ দ্বারা মুনাফিক উদ্দেশ্য, অথবা مَغْضُوْبِ দ্বারা ফাসিক ضَالِّيْنَ দ্বারা মন্দ আকীদা পোষণকারীদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

اٰمِيْنَ.

অনুবাদ

"আয় আল্লাহ! তুমি কবুল কর।"

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

সূরা ফাতিহা পাঠ করে 'আমীন' বলা মোস্তাহাব। 'আমীন' শব্দটি কুরআনের কোন আয়াত বা সূরার অংশ নয়। রাসূল (স) বলেন ঃ সূরা

ফাতিহা পাঠ করার পর হযরত জিব্রাইল (আ) আমাকে 'আমীন' বলতে শিখিয়েছেন। তিনি আরো বলেছেন, চিঠি-পত্রে যেভাবে সীল মোহর লাগানো হয়, তদ্রূপ সূরা ফাতিহার জন্য 'আমীন' সীল মোহরস্বরূপ। যখন কেহ সূরা ফাতিহা পাঠ করে 'আমীন' বলে তখন এর দ্বারা তার সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। রাসূল (স) বলেছেন ঃ আমাকে নামাযের মধ্যে ও অন্যত্র দো'আর পরে 'আমীন' বলার বিধান প্রদান করা হয়েছে। আমার পূর্বে হযরত মুসা (আ) ব্যতীত অন্য কেহ উক্ত বিধান প্রাপ্ত হয়নি। মুসা (আ) দু'আ করতেন আর হযরত হারুন (আ) বলতেন 'আমীন'। অতএব দু'আর পরে 'আমীন' বলবে। এতে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের দু'আ কবুল করবেন। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

শিক্ষা ঃ

১. প্রশংসা করতে হবে কেবল মাত্র আল্লাহর।

২. আল্লাহকে প্রতিপালক ও সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক মনে করতে হবে।

৩. আল্লাহ্ করুনাময় ও দয়ালু-দাতা তা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে হবে।

৪. আল্লাহকে বিচার দিবসের মালিক বলে স্বীকার করতে হবে।

৫. জীবনের সব ক্ষেত্রে দাসত্ব করতে হবে আল্লাহর।

৬. সকলকে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থী ও হিদায়েত প্রার্থী হতে হবে।

৭. বিজাতিদের ভাব-ধারা, আচার-আচরণ ও সংস্কৃতির প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে হবে।

২

আল-কুরআনের পরিচয়

২. সূরা আল-বাকারা

মদীনায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ২৮৬ রুকু-৪০

আলোচ্য আয়াত ঃ ১-৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি।

(١) الٓمّٓ (٢) ذٰلِكَ الْكِتَابُ لاَرَيْبَ فِيْهِ (ج) هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ (٣) الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ (٤) وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ (٥) اُولٰئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (১) আলিফ, লাম, মীম। (এর অর্থ আল্লাহই ভাল জানেন)। (২) ইহা সেই কিতাব যার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। ইহা মুত্তাকী বা আল্লাহভীরু লোকদের জন্য পথ প্রদর্শক। (৩) যারা অদৃশ্যের প্রতি ঈমান আনে, সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে জীবিকা দান করেছি তা থেকে তারা ব্যয় করে। (৪) আর আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছিল তার ওপর ঈমান আনে এবং যারা আখিরাতে দৃঢ় বিশ্বাসী। (৫) তারাই তাদের প্রতিপালকের নির্দেশিত পথে রয়েছে এবং তারাই সফলকাম।

শাব্দিক অনুবাদ ঃ الٓمّٓ ঃ (আলিফ, লাম, মীম) এগুলো মুতাশাবিহ তথা রহস্যাবৃত আয়াতসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এর যথার্থ অর্থ ও উদ্দেশ্য আল্লাহ ভাল জানেন। ذَالِكَ ঃ ইহা, এটা। اَلْكِتَابُ ঃ পূর্ণাঙ্গ কিতাব, গ্রন্থ। لاَرَيْبَ فِيْهِ ঃ এতে কোন সন্দেহ নেই। هُدًى ঃ পথ প্রদর্শনকারী। لِلْمُتَّقِيْنَ ঃ মুত্তাকীনদের (পরহেযগাদের) জন্য। اَلَّذِيْنَ ঃ যারা। يُؤْمِنُوْنَ ঃ বিশ্বাস স্থাপন করে। بِالْغَيْبِ ঃ অদৃশ্যের প্রতি। وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ ঃ এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে। وَمِمَّارَزَقْنَاهُمْ ঃ আর যে সম্পদ আমি তাদেরকে দিয়েছি, তা থেকে। يُنْفِقُوْنَ ঃ যারা ব্যয় করে। وَالَّذِيْنَ ঃ আর যারা। يُؤْمِنُوْنَ ঃ বিশ্বাস করে। بِمَا ঃ ঐ গ্রন্থের প্রতি। اُنْزِلَ ঃ যা অবতীর্ণ করা হয়েছে। اِلَيْكَ ঃ আপনার প্রতি। وَمَااُنْزِلَ ঃ এবং যা অবতীর্ণ করা হয়েছে। مِنْ قَبْلِكَ ঃ আপনার পূর্বে। وَبِالْاٰخِرَةِ ঃ এবং পরকালের প্রতি। هُمْ ঃ তারা। يُوْقِنُوْنَ ঃ সন্দেহাতীত বিশ্বাস রাখে। اُولٰئِكَ ঃ ঐ ব্যক্তিগণ। عَلٰي هُدًى ঃ সুপথে প্রতিষ্ঠিত। مِّنْ رَّبِّهِمْ ঃ তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে। وَاُولٰئِكَ هُمْ ঃ এবং তারাই। اَلْمُفْلِحُوْنَ ঃ সফলকাম, কামিয়াব।

সূরার নামকরণ ঃ সূরা বাকারা মদীনায় অবতীর্ণ। ইহা কুরআনের দীর্ঘতম সূরার অন্যতম। বাকারাতুন (بَقَرَةٌ) শব্দটি একবচন, এর বহুবচন বাকারা (بَقَرٌ) যার অর্থ গাভী। সূরাটির ৬৭ নং আয়াত থেকে ৭১ নং আয়াত পর্যন্ত বনী-ইসরাঈলের প্রতি একটি বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি গাভী যবাই করার আদেশ এবং তাদের অবাধ্যতা সম্পর্কিত ঘটনাবলী বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ৬৭ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً.

"যখন মূসা (আ) স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেন ঃ আল্লাহ তোমাদের একটি গরু যবাই করতে নির্দেশ দিয়েছেন।" (সূরা আল-বাকারা ঃ ৬৭)

অত্র আয়াতে উল্লেখিত بَقَرَةٌ শব্দ অবলম্বনে سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ (সূরা আল-

বাকারা) নামে সূরাটির নাম করণ করা হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এ সূরাটিতে গাভী যবাই করার ঘটনা ছাড়াও এমন বহু বিষয়ের আলোচনা ও হিদায়াত সন্নিবেশিত হয়েছে যা মানব জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া ইসলামী প্রজাতন্ত্রের চাহিদানুযায়ী শরীয়তের হুকুম-আহকামসমূহ এ সূরায় অবতীর্ণ করা হয় হয়েছে।

নাযিলের সময় কাল ঃ এ সূরার বেশীর ভাগ আয়াত মদীনায় হিজরতের পর মাদানী জীবনের একেবারে প্রথম যুগে নাযিল হয়। এর কিছু অংশ অবশ্য পরবর্তীকালে নাযিল হয়েছে।

আয়াতের শানে নুযুল

ক. মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রাসূল (স)-কে এ সুসংবাদ দিয়েছিলেন যে, আমি আপনার প্রতি আমার পক্ষ থেকে অতি গুরুত্বপূর্ণ বাণী অবতীর্ণ করব। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে ঃ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا "আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করবো গুরুত্বপূর্ণ বাণী।" (সূরা মুযযাম্মিল ঃ ৫) এর প্রেক্ষিতে যখন পবিত্র কুরআন নাযিল হতে শুরু করে তখন রাসূল (স) আল্লাহ তা'আলার নিকট আরয করলেন, 'এটাই কি সে বাণী যার প্রতিশ্রুতি আপনি দিয়েছিলেন? তখন ধারাবাহিকভাবে অত্র আয়াত নাযিল হয়।

খ. যখন রাসূল (স)-এর ওপর পবিত্র কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হতে শুরু করে তখন মালেক ইবনে সাইফ ইয়াহুদী মুসলমানদের অন্তরে সন্দেহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অপপ্রচার শুরু করে দিল, 'এ কুরআন সে কিতাব নয়; যার সংবাদ পূর্ববর্তী কিতাব দেয়া হয়েছে।' তখন আল্লাহ তা'আলা এ ধরনের বিভ্রান্তিকর উক্তি ও সন্দেহ দূর করার জন্য আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ করে বলেন ঃ "ইহা সেই কিতাব যার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই।"

অতঃপর চারটি আয়াত মুসলমানদের প্রশংসায়, দু'টি আয়াত কাফিরদের অসৎ চরিত্রের বর্ণনায় এবং তেরটি আয়াত মুনাফিকদের নিন্দায় অবতীর্ণ করেন। (লুবাবুন নুকূল)

বিষয়বস্তু ঃ এ সূরায় ইসলামের মৌলিক নীতিমালা বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন-নামায-রোযা, হজ্জ-যাকাত, বিবাহ-তালাক, হালাল-হারাম, ব্যবসা-বানিজ্য, জিহাদ-হিজরত ইত্যাদি। এছাড়াও বিশেষভাবে মু'মিনদের বৈশিষ্ট্য মুনাফিকদের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।

আয়াতের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

الٓمٓ-ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَارَيْبَ فِيْهِ.

অনুবাদ

"আলিফ, লাম, মীম। (এর অর্থ আল্লাহই ভাল জানেন) ইহা সেই কিতাব যার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই।"

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

الم ঃ এ হরফগুলো সূরা বাকারার প্রথম আয়াত । কুরআনের বহু সংখ্যক সূরার প্রথমে এরূপ এক বা একাধিক বর্ণসমষ্টি ব্যবহৃত হয়েছে এবং এগুলোকে এক একটি স্বতন্ত্র আয়াতরূপে পরিগণনা করা হয়েছে। এগুলোকে হরূফে مُقَطَّعَاتٌ এবং আয়াতে مُتَشَابِهَاتٌ বলা হয়। এর মমার্থ একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন। এ ব্যাপারে মুফাস্‌সিরীনে কিরামের বিশুদ্ধতম মত হচ্ছে ঃ اِنَّهَا سِرٌّ بَيْنَ اللهِ وَبَيْنَ حَبِيْبِهٖ অর্থাৎ এগুলো আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর হাবীব মুহাম্মদ (স) এর মাঝে রহস্যাবৃত ভাষ্য।

প্রখ্যাত মুফাস্‌সির হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, الٓمٓ ঃ দ্বারা اَنَا اللهُ اَعْلَمُ এর সংক্ষিপ্তরূপ বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আমি আল্লাহই সমধিক জ্ঞাত।

এ কুরআন আল্লাহ তা'আলার কালাম হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। পবিত্র কুরআনের সাবলীল ভাষা, বিস্ময়কর রচনাশৈলী ও অকাট্য যুক্তি তার যথার্থতা প্রমাণ করে। কিন্তু কেউ যদি অবাস্তব সন্দেহ-সংশয় পোষণ করে, তাতে পবিত্র কুরআনের বাস্তবতা বিনষ্ট হবে না; বরং এতে সত্য বিমুখতাই প্রমাণিত হবে। এজন্য পবিত্র কুরআনে সন্দেহের অস্তিত্ব

অস্বীকার করা হলেও সন্দেহকারীর অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়নি। উল্লেখ্য যে, কোন কালাম বা বক্তব্যে সন্দেহ ও সংশয় দু'কারণে হতে পারে-(১) কালাম ভুল (২) বুদ্ধিমত্তার স্বল্পতার দরুন বুঝার ভুল। এখানে প্রথম কারণ অসম্ভব। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলার কালাম নির্ভুল। সুতরাং সন্দেহের মূলে বিধর্মীদের মূর্খতাই হলো প্রধান কারণ। তাই বলতে হবে যে, এতে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না।

এটি মহাগ্রন্থের এক চিরন্তন শাশ্বত চ্যালেঞ্জ। আর আল-কুরআন চিরন্তন চ্যালেঞ্জের মুকাবিলায় উত্তীর্ণ গ্রন্থ। যখন এ গ্রন্থ হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর অবতীর্ণ হয় তখন আরবের লোকেরা কুরআনের ভাষার বিশুদ্ধতা, ভাষা অলংকার, রচনাশৈলী, বলিষ্ঠ যুক্তিধারা, অনুপম বিন্যাস ও ভাষার মাধুর্যে বিমোহিত হয়ে ইসলামের দিকে ধাবিত হতে শুরু করে। কিন্তু কতিপয় ইসলাম বিদ্বেষী কপট মুনাফিক জিদের বশবর্তী হয়ে একে কবিতা, যাদু বলে নানা অপবাদ রটাতে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে লক্ষ্য করে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলেন যদি সত্যি ইহা কোন মানুষের রচনা হয়ে থাকে তা হলে অনুরূপ একটি সূরা রচনা করে দেখাও।

وَاِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ، وَادْعُوْا شُهَدَاۤءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ.

অর্থ ঃ আমি আমার বান্দার ওপর যা অবতীর্ণ করেছি, তাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকলে তোমরা তাঁর অনুরূপ কোন সূরা রচনা করে আন। আর আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে ডাক। তোমরা যদি সত্যবাদী হও। (সূরা আল-বাকারা ঃ ২৩)

"বলুন, যদি এ কুরআনের মত কুরআন রচনার জন্য সমগ্র মানব ও জ্বিন জাতি সমবেত হয় এবং তারা পরস্পরকে সাহায্য করে, তবুও তারা এ কুরআনের মত কোন বাণী উপস্থাপন করতে পারবে না।" (বণী ইসরাঈল ঃ ৮৮)

এই চ্যালেঞ্জ মুকাবেলায় সে যুগেই শুধু নয় বর্তমান বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের যুগেও কেহ সফল হয়নি। সকলেই এক বাক্যে আরবের কবি গুরু লবীদ বিন রবীয়ার পুরানো সে কথাই বলতে বাধ্য হচ্ছে ঃ

لَيْسَ هٰذَا مِنْ كَلَامِ الْبَشَرِ "না-এটা কোন মানুষের বাণী নয়" তাই মহা আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে ঘোষণা করেছেন ঃ

وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ اَنْ يُّفْتَرٰى مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِىْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ تَفْصِيْلَ الْكِتَابَ لَارَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

"এই কুরআন এমন গ্রন্থ নহে যা আল্লাহ ব্যতীত অপর কারো দ্বারা উদ্ভাবিত হতে পারে। ইহা পূর্বতন সমুদয় খোদায়ী বাণীর সমর্থনকারী, আর ইহা সেই সমস্ত খোদায়ী গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ইহা বিশ্ব প্রতিপালকের পক্ষ হতে প্রেরিত।" (সূরা ইউনুস ঃ ৩৭)

تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ لَارَيْبَ فِيهِ مِنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

"রাব্বুল আলামীনের তরফ হতে এ কিতাব অবতরণের ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।" (সূরা সিজদাহ ঃ ২)

هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ.

অনুবাদ

"এ কিতাব মুত্তাকীদের জন্য পথ প্রদর্শক।"

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

আল-কুরআন হচ্ছে মানবতার মুক্তির এক মাত্র পথ। আল-কুরআনের অনুসরণেই কেবল পথ হারা জাতি পথের দিশা পেতে পারে। কুরআন হচ্ছে মুত্তাকীদের জন্য হিদায়াত। কুরআন মুত্তাকীদের পথ নির্দেশ ও কল্যাণ নিশ্চিত করে । এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনের ঘোষণা হচ্ছে ঃ

هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ.

অর্থ ঃ বস্তুতঃ এটা মানব জাতির জন্য সুস্পষ্ট সতর্কবাণী এবং আল্লাহকে যারা ভয় করে, তাদের জন্য এটা পথ নির্দেশ ও কল্যাণের উপদেশ। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৩৮)

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانُ.

"রমযান এমন একটি মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কুরআন, যা মানুষের জন্যে হেদায়াত এবং সত্যপথযাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথনির্দেশ আর হক-বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী দলিল।" (আল-বাকারা ঃ ১৮৫)

মুত্তাকীদের পরিচয় ঃ যারা মানুষের ওপর অন্যায়, অত্যাচার করে না এবং যাবতীয় পাপকার্য হতে নিজেদের কলুষমুক্ত রাখার জন্য সদা জাগ্রত ও সতর্ক। সততা, আমানতদারী, ধৈর্য, শোকর, আদল প্রভৃতি সকল প্রকার অনুপম চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী। তারা শরয়ী আহকাম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখেন ও তদানুযায়ী আমল করেন। তারা নিজেরা সৎকাজ করেন অন্যদেরকে সৎকাজের আদেশ দেন এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখেন। যে ব্যক্তির মধ্যে তাকওয়ার গুণাবলীর সমাহার ঘটে তাকে মুত্তাকী বলা হয়।

তাকওয়ার গুণ মানব চরিত্রের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। দুনিয়া ও আখেরাতের মূল ভিত্তি হচ্ছে তাকওয়া। আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিক্ষেত্রে তাক্ওয়ার প্রভাব অপরিসীম।

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি শিরক, কবীরাহ গুণাহ ও অশ্লীল বাক্য হতে নিজেকে বিরত রাখে তাকে মুত্তাকী বলা হয়। মহান রাব্বুল আলামীন পরবর্তী আয়াতে মুত্তাকীদের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন।

প্রথম গুণ ঃ

اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ.

অনুবাদ

"যারা অদৃশ্য বিষয়ের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে।"

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানদারের ব্যক্তির তেমনি কর্তব্য যেমনি আল্লাহর ওপর ঈমান আনা কর্তব্য।

ক. মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তারা ঐ অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ যা রাসূল (স) তাদেরকে দিয়েছেন, সেগুলোর ব্যাপারে নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে।

খ. অথবা বলা যায়, মুত্তাকীগণ রাসূল (স) ও মু'মিনদের উপস্থিতে যেমন আল্লাহকে বিশ্বাস করে, অদৃশ্য তথা অনুপস্থিত থাকা অবস্থায়ও যেন তারা আল্লাহর প্রতি তেমনি বিশ্বাস পোষণ করে। তাদের বিশ্বাস মুনাফিকদের মতো নয়; যারা সামনে ঈমান প্রকাশ করে আর পেছনে তাদের নেতাদের নিকট কুফরী প্রকাশ করে।

ঈমানের আভিধানিক অর্থ ঃ 'ঈমান' (اِيْمَانٌ) আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ঃ বিশ্বাস স্থাপন করা, দৃঢ়তা অবলম্বন করা, নিরাপত্তা দেয়া ইত্যাদি।

পারিভাষিক সংজ্ঞা ঃ জমহুর ওলামায় কেরামগণের মতে ঃ

اَلْاِيْمَانُ هُوَ التَّصْدِيْقُ بِمَاجَاءَ بِهِ النَّبِىُّ (صلعم) مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْاِقْرَارُ بِهٖ.

অর্থাৎ আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে নবী করিম (স) যা কিছু নিয়ে এসেছেন উহার প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন করা ও মৌখিক স্বীকৃতি প্রদান করাকে ঈমান বলে। জমহুর মুহাদ্দিসীনদের মতে ঃ

اَلْاِيْمَانُ هُوَ التَّصْدِيْقُ بِالْجِنَانِ وَالْاِقْرَارُ بِاللِّسَانِ وَالْعَمَلُ بِالْاَرْكَانِ.

অর্থাৎ আন্তরিক বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি এবং আরকানসমূহ কার্যতঃ বাস্ত বায়ন করাকে ঈমান বলা হয়। ইমাম আবু হানিফার (র)-এর মতে ঃ

اَلْاِيْمَانُ هُوَ التَّصْدِيْقُ بِالْجِنَانِ وَالْاِقْرَارُ بِاللِّسَانِ.

অর্থাৎ আন্তরিক বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকারোক্তিকে ঈমান বলা হয়।

শরীয়তের পরিভাষায় ঃ আল্লাহর একত্ববাদ ও রিসালাতের ওপর অটল-অবিচল আস্থা পোষণ তথা বিশ্বাস স্থাপন করাকে ঈমান বলা হয়।

ঈমানের উল্লেখিত সংজ্ঞা অনুযায়ী যিনি ঈমান আনয়ন করেন তাকে মু'মিন বলা হয়।

সর্বোপরি বলা যায় যে, মুখে আল্লাহর একত্ববাদের স্বীকারোক্তি দেয়া, অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং কাজে পরিণত করা-এ তিনটি জিনিসের সমষ্টি পূর্ণাঙ্গরূপে যার মধ্যে পাওয়া যাবে তাকে (مُؤْمِن كَامِل) তথা পূর্ণাঙ্গ মু'মিন বলা হবে।

তাই আমাদেরকে কামিলে মু'মিন হওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করতে হবে। ইসলামে সকল ইবাদত ও নেক আমলের ভিত্তি হলো ঈমান। ঈমান ব্যতীত কোন ইবাদত ও নেক কাজ আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় নয়। তাছাড়া পবিত্র কুরআন থেকে হিদায়াত লাভ করাও সম্ভব নয়।

হাদীসে ঈমানের সংজ্ঞা

عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صلعم) اَلْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ وَالْاِقْرَارُ بِاللِّسَانِ وَتَصْدِيْقٌ بِالْقَلْبِ وَعَمَلٌ بِالْاَرْكَانِ. (سراجى)

অর্থ ঃ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ আল্লাহর প্রতি ঈমান গ্রহণ হচ্ছে, মৌখিক স্বীকৃতি দেয়া, অন্তরে (সত্যি বলে) দৃঢ় বিশ্বাস রাখা এবং ইসলামের মূল বিষয়ের ওপর আমল করা। (সিরাজী)

যে বিষয়ের প্রতি ঈমান গ্রহণ করতে হবে

عَنْ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صلعم) اَلْاِيْمَانُ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلاَئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَتُؤْمِنَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْمِيْزَانِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ. (بيهقى)

অর্থ ঃ হযরত ওমর (রা) থেকে বর্নিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ ঈমান হচ্ছে ঃ (১) আল্লাহর প্রতি; (২) ফিরেশতাদের প্রতি; (৩) আল্লাহর কিতাবের প্রতি; ও (৪) রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন। (৫) বেহেশত; দোযখ ও মিজানকে বিশ্বাস করা; (৬) মৃত্যুর পর পুনরুত্থানে বিশ্বাস করা এবং (৭) তকদীরের ভাল ও মন্দে বিশ্বাস করা।

গায়েবের প্রতি বিশ্বাস

গায়েব (غَيْبُ) ঃ এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে অদৃশ্য, লুকায়িত, অনুপস্থিত। যা কিছু মানুষের অগোচরে তা অন্তরে থাকুক কিংবা না থাকুক। কুরআনে গায়েব অদৃশ্য অর্থে ববহৃত হয়েছে।

اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ.

"যারা ভয় করে তাদের প্রতিপালক আল্লাহকে না দেখে (غَيْبُ) তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহা পুরস্কার।" (সূরা মূলক ঃ ১২)

কুরআনে গায়েব (غَيْبُ) ৪৯ বার, গুয়ূব (غُيُوْبُ) ৪ বার এসেছে। (কুরআনের পরিভাষা ঃ ৪৯)

গায়েব এমনসব বস্তু যা বাহ্যিকভাবে মানবকুলের জ্ঞানের উর্ধ্বে এবং যা মানুষ পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করতে পারে না, চক্ষু দ্বারা দেখতে পায় না, কান দ্বারা শুনতে পায় না, নাসিকা দ্বারা ঘ্রাণ নিতে পারে না, জিহ্বা দ্বারা স্বাদ গ্রহণ করতে পারে না, হাত দ্বারা স্পর্শ করতে পারে না,–ফলে সে সম্পর্কে জ্ঞানলাভও করতে পারে না। কুরআনে غَيْبُ শব্দ দ্বারা সে সমস্ত বিষয়কেই বোঝানো হয়েছে যেগুলোর সংবাদ রাসূল (স) দিয়েছেন এবং মানুষ যে সমস্ত বিষয়ে স্বীয় বুদ্ধি বলে ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞান লাভে সম্পূর্ণ অক্ষম। যেমন আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী, ফেরেস্তা, অহী, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি। এ গভীর সত্যগুলোকে না দেখে মেনে নেয়া এবং নবী এগুলোর খবর দিয়েছেন বলে তাঁর খবরের সত্যতার প্রতি আস্থা রেখে এগুলোকে মেনে নেয়াই হচ্ছে 'ঈমান বিল গায়েব' বা অদৃশ্যে বিশ্বাস। এ সংশ্লিষ্ট আয়াতের অর্থ হচ্ছে এই যে, যে ব্যক্তি অদৃশ্য সত্যগুলো মেনে নিতে প্রস্তুত হবে একমাত্র সে-ই কুরআনের হিদায়াত ও পথনির্দেশনা থেকে উপকৃত হতে পারবে। আর যে ব্যক্তি মেনে নেয়ার জন্য দেখার, ঘ্রাণ নেয়ার ও আস্বাদন করার শর্ত আরোপ করে এবং যে ব্যক্তি বলে, আমি এমন কোন জিনিস মেনে নিতে পারি না যা পরিমাণ করা ও ওজন করা যায় না– সে এ কিতাব থেকে হিদায়াত ও পথনির্দেশনা লাভ করতে পারবে না। (তাফহীম ঃ ১ম খন্ড ৪৯)

দ্বিতীয় গুণ ঃ

وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ.

অনুবাদ

" এবং তারা নামায কায়েম করে।"

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

আলোচ্য আয়াতে ইকামতে সালাতের ব্যাখ্যায় মুফাস্‌সিরীন থেকে একাধিক উক্তি পাওয়া যায়। যেমন-

ক. নামাযের আরকান-আহ্‌কামসহ্ যথাযথভাবে নামায আদায় করা;

খ. একনিষ্ঠভাবে নামাযের পাবন্দী করা;

গ. নামাযের অভ্যস্ত হওয়া ও তা শরীয়তের নিয়মানুযায়ী আদায় করা। ইকামতে সালাত বা নামায কায়েম করা একটি ব্যাপক অর্থবোধক পরিভাষা। এর অর্থ কেবল নিয়মিত নামায পড়া নয় বরং সামষ্টিকভাবে নামাযের ব্যাবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত করাও এর অর্থের অন্তর্ভুক্ত। (তাফহীম ঃ ১ম খণ্ড টিকা ঃ ৫)

সালাত শব্দের অর্থ ঃ সালাত আরবী শব্দ। ফার্সি ভাষায় একে নামায বলে। এর প্রসিদ্ধ চারটি শাব্দিক অর্থ আছে। যথা ঃ (১) প্রার্থনা; (২) অনুগ্রহ; (৩) পবিত্রতা বর্ণনা করা; (৪) ক্ষমা প্রার্থনা করা ইত্যাদি।

আভিধানিক অর্থ ঃ আগুনে পুড়ে বাঁশ বা কাঠ নরম করে সোজা করাকে অভিধানে 'সালাত' বলে। সালাতের আরো কতিপয় অর্থ রয়েছে। যেমন- দু'আ, রহমত,বরকত,তা'যীম; ইয়াহুদীদের উপাসনালয়কে সালাত বলা হয়। (আল কুরআনের পরিভাষা ঃ ১২৩)

শরী'আতের পরিভাষায় সালাতের অর্থ ঃ নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত নিয়মে বিশেষ ইবাদতকে সালাত বলে। মি'রাজের রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায উম্মতে মুহাম্মাদীর উপর ফরয করা হয়েছে।

সালাতের গুরুত্ব ঃ ইসলাম পাঁচটি মূল ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। সালাত হল এর দ্বিতীয় ভিত্তি। ঈমানের পরই সালাতের স্থান। ইহা সর্বশ্রেষ্ঠ ফরয

ইবাদত। ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় সালাতের গুরুত্ব অপরিসীম। কুরআন ও হাদীসের আলোকে সালাতের গুরুত্ব নিম্নে তুলে ধরা হল।

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صلعم) لاَ اِيْمَانَ لِمَنْ لاَاَمَنَةَ لَهُ وَلاَصَلٰوةَ لِمَنْ لاَ طُهُوْرَلَهُ وَلاَ دِيْنَ لِمَنْ لاَ صَلٰوةَ لَهُ اِنَّمَا مَوْضِعُ الصَّلٰوةِ مِنَ الدِّيْنِ كَمِوضَعِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ. (المعجم الصغير)

অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যার আমানতদারী নেই, তার ঈমান নেই। যার পবিত্রতা নেই, তার নামায নেই। যার নামায নেই, তার দীন নেই। গোটা শরীরের মধ্যে মাথার যে মর্যাদা, দীন ইসলামে নামাযের সে মর্যাদা। (আল-মুজামুস সগীর)

সালাত মানুষকে আল্লাহর প্রভুত্ব কায়েম ও তাঁর আনুগত্য করার অনুভূতি জাগ্রত করে তোলে।

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ واٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ.

"আর তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও। আর বিনয় প্রকাশ কর বিনয়ীদের সাথে।" (আল-বাকারা ঃ ৪৩)

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى (ق) وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ.

"তোমাদের নামাযগুলো সংরক্ষণ করো, বিশেষ করে এমন নামায যাতে নামাযের সমস্ত গুণের সমন্বয় ঘটেছে। আল্লাহর সামনে এমনভাবে দাঁড়াও যেমন অনুগত সেবকরা দাঁড়ায়। (সূরা আল-বাকারা ঃ ২৩৮)

আল্লাহ তা'য়ালার নিকট সকল ইবাদতের মধ্যে সালাতই হলো সর্বোত্তম ইবাদত। মানুষ সালাতের মাধ্যমেই বিশ্ব স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের আনুগত্য প্রদর্শন করে এবং তাঁর আইন কানুন মেনে চলার সংকল্প প্রকাশ করে থাকে। এ জন্য মহানবী (স) বলেন ঃ

وَاعْلَمُوْا اَنَّ اَفْضَلَ اَعْمَالِكُمْ الصَّلٰوةَ.

"জেনে রাখো নামাযই তোমাদের সর্বোত্তম ইবাদত।"

সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে বান্দার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠে এবং বান্দা সর্বাধিক আল্লাহর নিকটবর্তী হয় এবং সান্নিধ্য লাভ করেন।

اَلصَّلٰوةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِيْنَ.

" সালাত মু'মিনের মি'রাজ স্বরূপ।"

اَلصَّلٰوةُ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ.

"সালাত জান্নাতের চাবিকাঠী।" (মুসনাদে আহমদ)

চাবি ছাড়া যেমন ঘরের তালা খোলা যায় না; তেমনি সালাত ছাড়া বেহেশতের দরজা খোলা যাবে না। সালাত হলো মহান আল্লাহ তা'য়ালাকে স্মরণ করার সর্বোত্তম পন্থা। যে যত বেশী সালাত আদায় করে, সে ব্যক্তি ততোধিক আল্লাহকে স্মরণ করে।

اِنَّنِيْ اَنَا اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعْبُدْنِيْ (لا) وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِيْ.

আমিই আল্লাহ, আমি ভিন্ন আর কোন মাবুদ নাই, সুতরাং আমারই ইবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম কর। (সূরা ত্ব-হা ঃ ১৪)

সালাত মু'মিন ও কাফিরের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে।

بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلٰوةِ.

"মুসলিম ও কাফির ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য হলো সালাত তরক করা।"

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ.

"যখন আমরা তাদেরকে ক্ষমতা দান করি তখন তারা সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, সৎকাজের আদেশ এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধ করে।" (সূরা আল-হাজ্জ ঃ ৪১)

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ.

"নিশ্চয়ই সালাত (মানুষকে) লজ্জাস্কর ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত রাখে।" (সূরা আনকাবুত ঃ ৪৫)

তৃতীয় গুণ ঃ

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ.

অনুবাদ

"আর আমি তাদেরকে যে জীবিকা দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে।"

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

আলোচ্য আয়াতের 'ব্যয়' শব্দের ব্যাখ্যায় মুফাস্‌সিরীন থেকে একাধিক উক্তি পাওয়া যায়। যেমন-

ক. ইতোপূর্বে যেহেতু নামাযের আলোচনা করা হয়েছে, তাই এখানে যাকাত অর্থ হওয়াটাই যুক্তিসঙ্গত।

খ. নফল দান-সদকা বুঝানো হয়েছে।

গ. আল্লাহর রাস্তায় অর্থ ব্যয় করার প্রবল আকাঙ্খা প্রত্যেক মু'মিনের মধ্যে বিশেষভাবে জাগ্রত করাই এ আয়াতের উদ্দেশ্য।

একজন সুস্থ-বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি চিন্তা করবে যে, আমাদের নিকট যা কিছু রয়েছে, তা সবই তো আল্লাহর দান ও আমানত। যদি আমরা সমস্ত ধন-সম্পদ তাঁর পথে ব্যয় করি, তবেই মাত্র এ নেয়ামতের হক আদায় হবে। পরন্তু এটা আমাদের পক্ষ থেকে কারো প্রতি কোন এহসান বা অনুগ্রহ হবে না। তবুও আল্লাহ তা'আলা মেহেরবাণী করে আমাদেরকে যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন তা সকল ব্যয় করার নির্দেশ না দিয়ে প্রয়োজন মোতাবেক তাঁর পথে অর্থ ব্যয় করার নির্দেশ দিয়েছেন। (মা'আরেফুল কুরআন)

ইনফাক শব্দের অর্থ ঃ ইনফাক শব্দটির মূল ধাতু (نفق) এর অর্থ সুড়ঙ্গ। যার এক দিক দিয়ে প্রবেশ করে অন্য আর একদিক দিয়ে বের হয়ে যায়। এ দিক দিয়ে অর্থ দাড়ায় মু'মিনদের জীবনে এক দিক দিয়ে বৈধ পন্থায় অর্থ আসবে অপর দিক দিয়ে বৈধ পন্থায় ব্যয় হবে। ফি সাবিলিল্লাহ অর্থ

আল্লাহ্র পথে। একামতে দীনের প্রয়োজন পূরণ, এর উপায়-উপকরণ সংগ্রহ ও এ মহান কাজটি পরিচালনার জন্যে সর্বাত্মক সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্যে সম্পদ খরচ করা। অতঃএব আল্লাহ্র দীনকে বিজয়ী করার জন্য যে অর্থ-সম্পদ প্রয়োজন তার জন্য এক মাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে খরচ করাকেই ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ্ বলে।

ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ্ বলতে কি বুঝায় ঃ ব্যাপক অর্থে নিজের ও নিজের পরিবার-পরিজনদের বৈধ প্রয়োজন পূর্ণ করা, আত্মীয়, প্রতিবেশী ও অভাবীকে সাহায্য করা জনকল্যাণমূলক কাজে অংশ গ্রহণ করা এবং আল্লাহ্র কালেমা বুলন্দ করার জন্য আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করাকে ইনফাক ফি সাবিল্লিলাহ্ বলা হয়। (সূরা আল-হজ্জ ঃ আয়াত ৩৫টীকা ৬৬ তাফহীম)

আল্লাহ্র পথে খরচ করার নির্দেশ ঃ আল্লাহ্র পথে খরচ করার জন্য পবিত্র কুরআনে নির্দেশ দিয়ে বলেন ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيْهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَّ لاَ شَفَاعَةٌ.

"হে মোমিনগণ! তোমরা দানকর, আমি যা তোমাদেরকে দিয়েছি তা থেকে সেদিন আসার পূর্বেই যেদিন বেচাকেনা, কোন বন্ধুত্ব এবং কোন সুপারিশ চলবেনা। (সূরা আল-বাকারা ঃ ২৫৪)

وَاَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلاَ اَخَّرْتَنِيْ اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ، فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ.

"আমি তোমাদেরকে যে রিয্ক দিয়েছি তা থেকে খরচ কর, তোমাদে মৃত্যু আসার আগেই। অন্যথায় অনুশোচনা করে বলতে হবে, হে পরোয়ারদেগার! আমাকে যদি অল্প কিছু সময়ের জন্যে অবকাশ দিতে আমি দান খয়রাত করতাম এবং সৎকর্মপরায়নদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। (সূরা আল-মুনাফিকুন ঃ ১০)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صلعم) قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنْفِقْ يَا اِبْنَ اٰدَمَ اُنْفِقْ عَلَيْكَ. (متفق عليه)

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'য়ালা মানব সন্তানকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ তুমি খরচ কর তোমার জন্য খরচ করা হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لاَتُظْلَمُوْنَ.

"তোমরা তোমাদের সম্পদ থেকে যা কিছু খরচ করে থাক তার যথার্থ প্রতিদান তোমাদেরকে দেয়া হবে। তোমাদের ওপর কোনরূপ অবিচার করা হবেনা।" (সূরা আল-বাকারা ঃ ২৭২)

আল্লাহর পথে খরচে সওয়াব অত্যধিক

عَنْ اَبِىْ يَحْيٰى خَرِيْمِ ابْنِ فَاتِكٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صلعم) مَنْ اَنْفَقَ نَفَقَةً فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كُتِبَ لَهُ سَبْعَ مِائَةَ ضُعْفٍ.(ترمذى)

অর্থ ঃ হযরত আবু ইয়াহিয়া খারীম ইবনে ফাতিক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন ঃ যে আল্লাহর পথে একটি জিনিস দান করলো, তার জন্যে সাতশত গুণ সাওয়াব লিখা হবে। (তিরমিযী)

চতুর্থ গুণ ঃ

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ

অনুবাদ

"আর আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছিল তাতে যারা ঈমান আনে।"

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

মুত্তাকীদের আরো গুণাবলী হচ্ছে যে, তারা মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি ও তাঁর পূর্ববর্তী রাসূলগণের প্রতি নাযিলকৃত কিতাবসমূহের ওপর বিশ্বাস স্থাপন

করে। অর্থাৎ এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, পূর্ববর্তী নবীগণ এবং তাঁদের আনীত কিতাব সত্য। সে সময় ঐ সকল কিতাব অনুযায়ী আমল করা ঈমানের দাবী ছিল। কুরআন অরতীর্নের পর পূর্ববতী সকল নবীর কিতাব মনসূখ হয়ে গিয়েছে এখন শুধু মাত্র আল-কুরআনের বিধানকে মানতে হবে এবং সে অনুযায়ী আমল করতে হবে। যারা পূর্ববর্তী কিতাবের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে এবং অহী ও নবুওয়তের প্রয়োজন আছে বলে মনে করে না, আল্লাহর আইনের পরিবর্তে নিজেদের মনগড়া মতবাদকে আল্লাহর বিধান বলে ঘোষণা করে তারা নিজেদেরকে ইসলামের ধারক-বাহক বলে মনে করলেও তাদের জন্য কুরআনের হিদায়াতের দুয়ার রুদ্ধ।

পঞ্চম গুণ ঃ

وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ.

অনুবাদ

"এবং যারা আখিরাতে দৃঢ় বিশ্বাস করে।"

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

এ আয়াতে মুত্তাকীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ বর্ণনা করা হয়েছে। তা হচ্ছে, আখিরাত বা পরকালের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা। আখিরাতের প্রতি ঈমানই এমন এক কার্যকর নিয়ন্ত্রণবিধি, যা মানুষকে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সর্বত্রই যে কোন গর্হিত আচরণ থেকে অত্যন্ত কার্যকরভাবে বিরত রাখে। তার অন্তরে এমন এক প্রত্যয়ের অম্লান শিখা অবিরাম সমুজ্জ্বল করে দেয় যে, আমি প্রকাশ্যই থাকি আর গভীর নির্জনেই থাকি, রাজপথে থাকি কিংবা কোন বদ্ধঘরে লুকিয়েই থাকি, মুখে বা ভাব-ভঙ্গিতে প্রকাশ করি আর নাই করি, আমার সকল আচরণ, আমার সকল অভিব্যক্তি, এমনকি অন্তরে লুকায়িত প্রতিটি আকাঙ্খা পর্যন্ত সর্বত্র বিরাজমান এক মহাসত্তার সামনে রয়েছে। তাঁর সদাজাগ্রত দৃষ্টির সামনে কোন কিছুই আড়াল করার সাধ্য আমার নেই।

আমার সত্তার সাথে মিশে রয়েছে এমনসব প্রহরী, যারা আমার প্রতিটি আচরণ এবং অভিব্যক্তি প্রতিমুহূর্তেই লিপিবদ্ধ করছেন। উপরোক্ত

বিশ্বাসের মাধ্যমেই প্রাথমিক যুগে এমন মহোত্তম চরিত্রের অগণিত লোক সৃষ্টি হয়েছিলেন, যাদের চাল-চলন এবং আচার-আচরণ দেখেই মানুষ ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধায় অবনত হয়ে পড়তো। (মা'আরেফুল কুরআন)

আখিরাত

আখিরাত অর্থ পরকাল। ইহকালই মানব জীবনের শেষ নয়; মৃত্যুর পরও মানুষের জন্য রয়েছে এক অনন্ত জীবন। যেখানে মানুষকে তার পার্থিব জীবনের ভাল ও মন্দ কাজের যাবতীয় হিসাব দিতে হবে। কঠিন বিচারের পর তাকে ভাল কাজের প্রতিদান স্বরূপ জান্নাত ও মন্দ কাজের প্রতিদান স্বরূপ জাহান্নামে প্রবেশ করতে হবে। এটাই হল আখিরাত।

আখিরাত অর্থ ঃ আখিরাত শব্দটি আরবী (اُخْرٌ) শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ -শেষ, পরে, পরবর্তী, শেষ পরিণতি, শেষ ফল, পরজীবন, পরকাল, কিয়ামত, দ্বিতীয় আলম ইত্যাদি।

ইসলামী শরীআতের পরিভাষায়, মৃত্যুর পর হতে মানুষের যে অনন্ত জীবনকাল আরম্ভ হয়, তাকে আখিরাত বলে।

পার্থিব জীবনের পর যে অনন্ত জীবনকাল তাই কুরআনের পরিভাষায় আখিরাত। মৃত্যু পরবর্তী অনন্ত জীবনস্থলকে দারুল আখিরাত বলা হয়। (কুরআন পরিচিতি পৃঃ ৬৭)

কুরআনে আখিরাত শব্দের ব্যবহার ঃ

কুরআনে ৪৯ বার দুনিয়া ও আখিরাত একত্রে ব্যবহৃত হয়েছে এবং স্বতন্ত্রভাবে আখিরাত ও ইয়াওমুল আখিরাত ৯৪ বার ব্যবহৃত হয়েছে। (কুরআনের পরিভাষা ঃ ২৮)

ইহকালই মানব জীবনের শেষ পরিণতি নয়। মৃত্যুর পরেও মানুষের জন্য রয়েছে এক অনন্ত জীবন। সেখানে মানুষকে তার পার্থিব জীবনের ভাল ও মন্দ কাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব দিতে হবে। কঠিন বিচারের পরই জান্নাত বা জাহান্নাম রূপে তার যথাযথ ফল ভোগ করতে হবে। এটাই হল আখিরাত। তাই জাহান্নামের আযাব থেকে জান্নাতের চিরসুখ ও অনাবিল

শান্তি লাভের মধ্যেই জীবনের প্রকৃত সাফল্য নিহিত। আল্লাহ তা'য়ালা এ সম্পর্কে বলেন ঃ

وَاِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ هِيَ الْحَيَوَانُ لَوْكَانُوْا يَعْلَمُوْنَ.

"নিশ্চয়ই পরকালীন জীবনই হল প্রকৃত জীবন। যদি তারা জানত!" (আনকাবুত ঃ ৬৪)

وَلِلْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَّاَكْبَرُ تَفْضِيْلاً.

"নিশ্চয়ই পরকালই হচ্ছে সম্মান ও মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ।" (আল-ইসরা ঃ ২১)

وَلَدَارُ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِيْنَ.

"আখিরাতের আবাসই উত্তম এবং তা খোদা ভীরুদের জন্য কতই না সুন্দর আবাস!"(আন- নহল ঃ ৩০)

মহান আল্লাহ তা'য়ালা মানব জাতিকে এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে। এ পৃথিবীকে তিনি অসংখ্য লোভ, লালসা, আকর্ষণ ও চাকচিক্যময় করে সাজিয়েছেন। যাতে মু'মিন বান্দাগণ দুনিয়ার ক্ষণিকের জীবনে বন্ধুর পথ পরিক্রমা পাড়ি দিয়ে আখিরাতের অফুরন্ত নি'য়ামত ও অনাবিল শান্তিময় জগতে পৌঁছতে পারে।" আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন ঃ "হে আমার সম্প্রদায়! দুনিয়ার জীবন হচ্ছে সামান্য। আর আখিরাত হল চিরস্থায়ী চিরন্তন আবাস।" (সূরা আল-গাফির ঃ ৩৯)

وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى.

"আর আখিরাত হল উত্তম ও চিরস্থায়ী শ্বাশত।" (সূরা আল-আলা ঃ ১৭)

وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌلَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى.

"আর আখিরাত হবে তোমার জন্য (হে নবী) দুনিয়া থেকে উত্তম।"

(সূরা আদ-দুহা ঃ ৪)

আখিরাতের পর্যায়সমূহ ঃ আখিরাতের দু'টি পর্যায় রয়েছে। যথা ঃ (১) আলমে বারযাখ (২) আলমে হাশর।

(১) আলমে বারযাখ ঃ বারযাখ শব্দের অর্থ -পর্দা, অন্তরায়, ব্যবধান ইত্যাদি। (আল-ওয়াসীত ১/৪৯)

মৃত্যু হতে কিয়ামত পর্যন্ত লোক চক্ষুর অন্তরালের সময়কে বারযাখ বা মধ্যবর্তী জগত বলে। মানুষের মৃত্যুর পরবর্তী জীবন হল কবর। আর কবর থেকেই শুরু হয় পার্থিব জীবনের হিসাব নিকাশের ধারা। পাপী বান্দারা কৃতকর্মের ফল আযাব ও শাস্তি ভোগ করবে এবং খোদাভীরু ঈমানদার বান্দারা বেহেশতের নাজ-নিয়ামত ভোগ করবে। মানুষের মৃত্যুর পর থেকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আলমে বারযাখের ব্যপ্তি।

وَمِنْ وَّرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ.

"আর তাদের পশ্চাতে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত বিস্তৃত এক মধ্যবর্তী জীবন রয়েছে।" (সূরা আল-মু'মিন ঃ ১০০)

(২) আলমে হাশর ঃ আলমে হাশর হলো সমবেত হওয়ার জগৎ। যেখানে মানব ও জ্বীন জাতিকে তাদের হিসাব-নিকাশ দেয়ার জন্য উপস্থিত করা হবে। আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশে হযরত ইস্রাফিলের (আ) শিংগায় প্রথমবার ফুৎকারে মহাপ্রলয় অনুষ্ঠিত হবে। দ্বিতীয়বার ফুৎকারে সৃষ্টি জীব কবর থেকে পুনরুত্থিত হয়ে দলে দলে একটি ময়দানে এসে সমবেত হবে।

وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَاِذَا هُمْ مِّنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ، قَالُوْا يَاوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا.

"এবং শিংগায় ফুঁক দেওয়া হবে, তখনই তারা কবর থেকে তাদের পালনকর্তার দিকে ছুটে চলবে। তারা বলবে হায়! আমাদের দুর্ভোগ, কে আমাদেরকে নিদ্রাস্থল থেকে উত্থিত করলো? (সূরা ইয়াসিন ঃ ৫১) .

"তোমরা মৃত্যু বরণ করো কিংবা নিহত হও, আল্লাহর কাছে তোমাদের একত্র করা হবেই। (সূরা আলে-ইমরান ঃ ১৫৮)

অতঃপর প্রত্যেকেরই আমল নামা উপস্থিত করা হবে ও বিচার কার্য শুরু হবে। হিসাব-নিকাশের পর যার নেকের পাল্লা ভারী হবে, সে হবে

জান্নাতী। আর বেঈমান, কাফির, মুশরিক ও অপরাধীদের জন্য ঠিকানা হবে জাহান্নাম, যাদের গুণাহের পাল্লা ভারী হবে।

أُوْلَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ، وَأُوْلَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ.

অনুবাদ

"তারাই তাদের প্রতিপালকের নির্দেশিত পথে রয়েছে এবং তারাই সফলকাম।"

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, নিজে সালাত আদায় করে ও সমাজ ভিত্তিক সালাতের পরিবেশ সৃষ্টি করে, আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ হতে ব্যয় করে, নবী করীম (স) ও তাঁর পূর্ববর্তী নবীদের ওপর নাযিলকৃত কিতাব সমূহের ওপর ঈমান রাখে এবং আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে, তারাই হবে নিজেদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সুপথ প্রাপ্ত, আর তারাই যথার্থ সফলকাম। এ আয়াতে হুদা (هُـدًى) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আল কুরআনে এ শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন- পথ, তরীকা ও হিদায়াত। আমার পক্ষ হতে তোমাদের কাছে যখন হিদায়াত (هُدًى) আসবে তখন যারা আমার হিদায়াত (هُدَاىَ) মেনে চলবে তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। (সূরা বাকারা ঃ ৩৮)

শিক্ষা ঃ

১. আল-কুরআন হচ্ছে মানবতার মুক্তির দিশারী।

২. যুক্তির অবতারণা ব্যতীত গায়েবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।

৩. সমাজ ভিত্তিক সালাত কায়েমের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

৪. আল্লাহর দেয়া সম্পদ তাঁরই পথে ব্যয় করতে হবে।

৫. সকল আসমানী কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।

৬. আখিরাতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে।

৭. কুরআন অনুসরণের মধ্যেই মুক্তি নিহিত একথা মনে রাখতে হবে।

৩

শহীদের মর্যাদা

২. সূরা-আল-বাকারা

মদীনায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত-২৮৬, রুকু-৪০

আলোচ্য আয়াত ঃ ১৫৩-১৫৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি।

(١٥٣) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ط اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ. (١٥٤) وَلَاتَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ط بَلْ اَحْيَاۤءٌ وَّلٰكِنْ لَّاتَشْعُرُوْنَ (١٥٥) وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَىْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ط وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ (١٥٦) الَّذِيْنَ اِذَاۤ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ لا قَالُوْۤا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّاۤ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ (١٥٧) اُولٰۤئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ قف وَاُولٰۤئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (১৫৩) হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে (আল্লাহর কাছে) সাহায্য প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। (১৫৪) আল্লাহর পথে যারা নিহত হয় তোমরা তাদেরকে মৃত বল

না, বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা উপলব্ধি করতে পার না। (১৫৫) আমি (আল্লাহ্) তোমাদিগকে কোন কিছুর ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, (তোমাদের) জীবন, ফলমূল ও ফসলাদির ক্ষয়ক্ষতি দিয়ে অবশ্যই পরীক্ষা করবো। আর আপনি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দান করুন। (১৫৬) (ধৈর্যশীল) তারা-যাদের ওপর যখনই কোন বিপদ আপতিত হয় তখন বলে, নিশ্চয় আমরা আল্লাহ্‌রই এবং অবশ্যই আমরা তাঁর নিকট ফিরে যাবো। (১৫৭) এরাই হচ্ছে তারা যাদের ওপর তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে দয়া ও করুণা অবতীর্ণ হয়। আর এরাই সৎপথ প্রাপ্ত।

শাব্দিক অনুবাদ : يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُـوْا : হে ঈমানদারগণ! اِسْتَعِيْنُوْا : তোমরা সাহায্য চাও। بِـالصَّبْرِ : ধৈর্যসহকারে। وَالصَّلٰوةِ : নামাযের মাধ্যমে। اِنَّ اللّٰهَ : নিশ্চয় আল্লাহ। مَعَ الصّٰبِرِيْنَ : ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। وَلَاتَقُوْلُـوْا : তোমরা বলো না। لِمَنْ : তাঁদেরকে। يُّقْتَلُ : যে নিহত হয়েছে। فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ : আল্লাহর পথে। اَمْوَاتٌ : মৃত بَلْ اَحْيَاءٌ : বরং তারা জীবিত। وَلٰكِنْ : কিন্তু। لَّاتَشْعُرُوْنَ : তোমরা উপলব্ধি করতে পার না। وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ : আর আমি অবশ্যই। بِشَىْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ : কিছু, ভয় ভীতির দ্বারা। وَالْجُوْعِ : এবং ক্ষুধা। وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ : ধন-সম্পদের ক্ষতি। وَالْاَنْفُسِ : এবং জীবন। وَالثَّمَرٰتِ : ফলফলাদি। وَبَشِّـرِ الصّٰبِرِيْنَ : এবং আপনি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দিন। اَلَّذِيْنَ : যারা। اِذَا : যখন। اَصَابَتْهُمْ তাদের ওপর আপতিত হয়। مُّصِيْبَةٌ : কোন বিপদ। قَالُوْٓا : তারা বলে। اِنَّا لِلّٰهِ : আমরা তো- আল্লাহর-ই জন্য। وَاِنَّا اِلَيْـهِ : এবং আমরা তার-ই দিকে। رٰجِعُوْنَ : প্রত্যাবর্তনকারী। اُولٰٓئِكَ : ঐসবলোক। عَلَيْـهِمْ : তাদের ওপর রয়েছে। صَلَوٰتٌ : অনুগ্রহরাজি। مِّـنْ رَّبِّـهِمْ : তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে। وَرَحْمَةٌ : এবং করুণা। وَاُولٰٓئِكَ هُمُ মূলতঃ ঐসবলোকেরাই। الْمُهْتَدُوْنَ : সঠিক পথ প্রাপ্ত।

আয়াতের শানে নুযূল : বদর যুদ্ধে ১৪জন সাহাবী নিহত হলে মুসলমাগণ

মর্মাহত হন। এদিকে মুনাফিক ও ইহুদীরা বলতে শুরু করে যে, লোকগুলো ইচ্ছা করে গিয়ে (مَـوْتٌ) মৃত্যুবরণ করল। মু'মিনগণ অসাবধানতাবশতঃ মুনাফিকদের মন্তব্যের মত তাদের ক্ষেত্রে (مَوْتٌ) শব্দ ব্যবহার করলে আল্লাহ তা'য়ালা উল্লেখিত আয়াত অবতীর্ণ করে ঘোষণা করলেন, "যারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে শাহাদাত বরণ করে তাদেরকে তোমরা মৃত বলো না; বরং তারা জীবিত। তোমরা তা বুঝতে পারো না।"

আয়াতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ.اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ.

অনুবাদ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।"

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন যে, বিপদে-আপদে আমরা তাঁর কাছে কিভাবে সাহায্য প্রার্থনা করব। বিপদে ধৈর্য ধারণ করা খাঁটি মু'মিনের বৈশিষ্ট্য। সালাত হচ্ছে মু'মিনের মূল পরিচয়। সালাতের মাধ্যমে বান্দা তার দেহ-মন সব কিছুকে আল্লাহর সামনে নত করে দেয় এটা আল্লাহর আনুগত্যের চরম পরাকাষ্ঠা। অন্য এবাদতে এভাবে করা হয় না তাই নামাযের মাধ্যমে যে দু'আ করা হয় আল্লাহ তা'আলা তা কবুল করেন।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা মওদূদী (র) যা বলেছেন তার সার কথা হচ্ছে এই যে, মুমিনদের আল্লাহ পৃথিবীতে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য পাঠিয়েছেন। এ কাজ বড়ই কঠিন। এ দায়িত্ব পালন করতে অনেক বিপদ-আপদ, দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়। এ সব বিপদ মুসিবতে ধৈর্যের সাথে এগোতে পারলে আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত বর্ষিত হতে থাকবে। (তাফহীমুল কুরআন)

সবর অর্থ ঃ "সবর" (صَبْرٌ) আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ -ধৈর্য। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়- বিপদ-আপদ, দুঃখ-কষ্ট, রোগ-ব্যাধি,

ক্ষুধা-তৃষ্ণা, অন্যায়-অত্যাচার ইত্যাদি বালা-মুসিবতে কোনরূপ বিচলিত না হয়ে, অবিচল চিত্তে সব কিছু আল্লাহর ওপর ন্যস্ত করে ধৈর্য ধারণ করাকে "সবর" বলে। যিনি ধৈর্য ধারণ করেন তাকে সাবের বা ধৈর্যশীল বলে।

ধৈর্যশীল বলতে বুঝানো হয়েছে সে ব্যক্তিকে, যে লোক নিজের নফসকে কাবু করে রাখতে পারে এবং ভাল মন্দ উভয় অবস্থায়ই বান্দার উপযোগী আচরণে অবিচল থাকে। ভাল সময় হলে নিজের সত্তাকে ভুলে গিয়ে আল্লাহদ্রোহীতা আর মন্দ সময় হলে হতাশ হয়ে পড়বে ও সর্ব প্রকারের হীন ও নীচ আচরণ করতে শুরু করবে। এরূপ অবস্থা তার কখনই হয় না। (তাফহীমুল কুরআন)

সুখ-দুঃখ মানুষের জীবনের সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। মানুষ কোন সময়, রোগ, শোক, দারিদ্র বা অন্য কোন বিপদাপদের সম্মুখীন হতে পারে। এমতাবস্থায়, তাকে ভেঙ্গে পড়লে চলবে না বরং সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে ধৈর্যধারণপূর্বক সকল প্রতিকূল অবস্থার মোকাবেলা করতে হবে এবং বলতে হবে।

اِنَّالِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ.

"নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তারই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো।" (বাকারা ঃ ১৫৬)

সবরের গুরুত্ব

ধৈর্য মানব জীবনের একটি বিশেষ গুণ। ধৈর্য মানব জীবনকে সাফল্য মন্ডিত করার ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই প্রবাদ আছে, "ধৈর্য প্রশস্ততার চাবিকাঠি" ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে শান্তি শৃঙ্খলা ও কল্যাণকর জীবন যাপনের জন্য সবরের গুরুত্ব অপরিসীম।

اَلصَّبْرُ نِصْفُ الْاِيْمَانِ.

"ধৈর্য ঈমানের অর্ধাংশ।" (মুসলিম)

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ.

আল্লাহ তা'য়ালা ধৈর্যধারণ কারীদের সাথে আছেন। (সূরা বাকারা ঃ ১৫৩)

يَاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا وَرَابِطُوْا، وَاتَّقُوا.اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্যধারণ কর, পরস্পর ধৈর্য়ধারণের প্রতিযোগিতা কর এবং ধৈর্য সহকারে পরস্পরকে শক্তিশালী কর। আর আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।" (আলে ইমরান)

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصَّابِرِيْنَ.

"আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালবাসেন।"

হযরত আনাস (রা) রাসূল (স) হতে বর্ণনা করেনঃ কিয়ামতের দিন ইনসাফের দাড়ি পাল্লা স্থাপন করা হবে। দাতাগণ আগমন করলে তাদের দান খয়রাত ওজন করে সে পূর্ণ সওয়াব দান করা হবে। এমনিভাবে নামায, হজ্জ ইত্যাদি ইবাদতকারীদের এবাদত মেপে তাদেরকে প্রতিদান দেয়া হবে। অতঃপর বালা মুসিবতে সবরকারীরা আগমন করলে তাদের জন্য কোন ওজন মাপা হবে না; বরং তাদেরকে অপরিমিত ও অগণিত প্রতিদান দেয়া হবে। আল্লাহর বাণী ঃ

اِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

যারা সবরকারী তাদেরকে অগণিত প্রতিদান দেওয়া হবে। (যুমার ঃ ১০)

فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيْلاً.

"অতএব সবর করো, সবরে জামীল।" (সূরা মায়ারিজ ঃ ৫)

সালাত শব্দের অর্থ ঃ সালাত আরবী শব্দ। ফার্সি ভাষায় একে নামায বলে। এর প্রসিদ্ধ চারটি শাব্দিক অর্থ আছে। যথা ঃ (১) প্রার্থনা; (২) অনুগ্রহ; (৩) পবিত্রতা বর্ণনা করা; (৪) ক্ষমা প্রার্থনা করা ইত্যাদি।

আভিধানিক অর্থ ঃ আগুনে পুড়ে বাঁশ বা কাঠ নরম করে সোজা করাকে অভিধানে 'সালাত' বলে। সালাতের আরো কতিপয় অর্থ রয়েছে। যেমন- দু'আ, রহমত, বরকত, তা'যীম; ইয়াহুদীদের উপাসনালয়কে সালাত বলা হয়। (কুরআনের পরিভাষা ঃ ১২৩)

শরী'আতের পরিভাষায় সালাতের অর্থ ঃ নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত নিয়মে বিশেষ ইবাদতকে সালাত বলে। মি'রাজের রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায উম্মতে মুহাম্মাদীর ওপর ফরয করা হয়েছে।

সালাতের গুরুত্ব ঃ ইসলাম পাঁচটি মূল ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। ঈমানের পরই সালাতের স্থান। ইহা সর্বশ্রেষ্ঠ ফরয ইবাদত। ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় সালাতের গুরুত্ব অপরিসীম। মহানবী (স) বলেন ঃ

وَاعْلَمُوْا اَنَّ اَفْضَلَ اَعْمَالِكُمُ الصَّلٰوةَ.

"জেনে রাখো নামাযই তোমাদের সর্বোত্তম ইবাদত।"

সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে বান্দার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠে এবং বান্দা সর্বাধিক আল্লাহর নিকটবর্তী হয় এবং সান্নিধ্য লাভ করেন।

اَلصَّلٰوةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِيْنَ.

"সালাত মু'মিনের মি'রাজস্বরূপ।"

اَلصَّلٰوةُ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ.

"সালাত জান্নাতের চাবিকাঠী।" (মুসনাদে আহমদ)

সালাত হলো মহান আল্লাহ তা'য়ালাকে স্মরণ করার সর্বোত্তম পন্থা।

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ.

"আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম কর।" (সূরা ত্ব-হা ঃ ১৪)

সালাত মু'মিন ও কাফিরের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে। মু'মিন সালাত কায়েম করে আর কাফির ব্যক্তি সালাত পরিত্যাগ করে।

بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلٰوةِ.

"মুসলিম ও কাফির ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য হলো সালাত তরক করা।" (মুসলিম)

সালাত আদায়ের মাধ্যমেই দুনিয়ার কল্যাণ ও পরকালের সাফল্য অর্জন করা যায়।

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ، الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلاَتِهِمْ خَاشِعُوْنَ.

"যে সকল মু'মিন সালাতে বিনয়াবনত তাদের জীবন সাফল্যমণ্ডিত।" (আল-মু'মিনুন ঃ ১-২)

মহানবী (স) বলেন ঃ ঠিক মত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় কারীকে আল্লাহ পাঁচটি পুরস্কার দান করবেন। যথা ঃ

১.জীবিকার কষ্ট দূর করবেন;

২.কবরের আযাব থেকে মুক্তি দেবেন;

৩.ডান হাতে আমলনামা দেবেন;

৪. পুলসিরাত বিজলীর ন্যায় পার করাবেন;

৫. বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন।

وَلاَتَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ (ط) بَلْ اَحْيَاءٌ وَّلٰكِنْ لاَّتَشْعُرُوْنَ.

অনুবাদ

"আল্লাহর পথে যারা নিহত হয় তাদের তোমরা মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত। তবে তোমরা তা উপলব্ধি করতে পার না।"

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

মৃত্যু শব্দটি এবং এর ধারণা মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার করে। মৃত্যুর কথা শুনে সে সাহস ও শক্তি হারিয়ে ফেলে। তাই আল্লাহর পথে শহীদদেরকে মৃত বলতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ মৃত্যু বললে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জিহাদ, সংঘর্ষ ও প্রাণ উৎসর্গ করার প্রেরণা স্তব্ধ হয়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা দেবে। এর পরিবর্তে ঈমানদারদের মনে এই চিন্তা বদ্ধমূল করতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর পথে যে ব্যক্তি প্রাণ দেয় সে আসলে চিরন্তন জীবন লাভ করে। এই চিন্তাটি প্রকৃত ব্যাপারের সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীলও। এ চিন্তা পোষণের ফলে সাহস ও হিম্মত তরতাজা থাকে এবং উত্তরোত্তর বেড়ে যেতে থাকে। (তাফহীমুল কুরআন)

স্বাভাবিক মৃত্যুর চেয়ে শহীদী মৃত্যু অনেক শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদার। কাজেই স্বাভাবিক মৃত্যু ও শহীদী মৃত্যুর ক্ষেত্রে اَمْوَاتٌ শব্দের প্রয়োগ যথার্থ নয়। তাই যারা আল্লাহর পথে জীবন দান করবেন তাদের জন্য شَهِيْدٌ শহীদ

শব্দ ব্যবহার করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। সুতরাং যারা আল্লাহ্‌র পথে প্রাণ দেয় তাদেরকে মৃত না বলে শহীদ বলতে হবে।

بَلْ اَحْيَاءٌ : 'শহীদগণ জীবিত' যদিও শহীদগণ বাহ্যত মৃত্যুবরণ করে, তবুও আল্লাহ তাদেরকে জীবিত বলেছেন। তবে তাদের জীবিত থাকার অবস্থাটা কিরূপ তা নিয়ে অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন-

কাফির-মুশরিকরা শহীদদের যে তুচ্ছার্থে মৃত বলত সেভাবে তাদের মৃত বলতে নিষেধ করা হয়েছে।

সাইয়েদ কুতুব বলেন, দীন যেহেতু জীবিত, কাজেই দীনের জন্য যারা প্রাণ দিয়েছে তারা মরেও জীবিত হয়ে আছে।

হাদীসের ভাষ্য মতে, শহীদদের রূহকে আল্লাহ সবুজ পাখির মধ্যে পুরে দেন। তারা জান্নাতে ঘুরে বেড়ায় এবং রিযিক প্রাপ্ত হয়।

তবে একথা সত্য যে, তারা আমাদের মত সশরীরে জীবিত নন। তাদের জীবিত থাকার অবস্থা আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন।

কারণ তিনি বলেছেন, بَلْ اَحْيَاءٌ وَّلٰكِنْ لاَّتَشْعُرُوْنَ "বরং তারা জীবিত, তবে তোমরা তা উপলব্ধি করতে পার না।

শহীদের মর্যাদা

عَنْ اَنَس (رض) اَنَّ النَّبِيَّ (صلعم) قَالَ : مَااَحَدٌ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ اَنْ يَرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا وَاَنَّ لَهُ مَا عَلَى الْاَرْضِ مِنْ شَيْءٍ ، اِلاَّ الشَّهِيْدَ فَاِنَّهُ يَتَمَنّٰى اَنْ يَرْجِعَ اِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ، لِمَا يَرٰى مِنَ الْكَرَامَةِ، وَفِىْ رِوَايَةٍ، لِمَا يَرٰى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ. (بخارى، مسلم، ترمذى)

অর্থ ঃ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত। রাসূল (স) এরশাদ করেছেন ঃ কোন বেহেশত বাসীকে যদি দুনিয়ার সকল সম্পদ দেয়া হয়, তথাপি সে পৃথিবীতে ফিরে যাওয়া পছন্দ করবে না। একমাত্র শহীদ ব্যক্তিই এর ব্যতিক্রম। সে কামনা করবে, দুনিয়াতে পুনরায় তাকে পাঠানো হোক এবং

আর দশ বার সে শাহাদাত লাভ করে আসুক। শাহাদাতের মর্যাদা ও সম্মান সে (নিজ চোখে) দেখবে, তার কারণেই সে এরূপ আকাঙ্খা করবে। (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صلعم) مَـايَجِدُ الشَّـهِيْدُ مِـنْ مَسِّ الْقَتْلِ اِلاَّ كَمَا يَجِدُ اَحَدُكُمْ مِنْ مَسِّ الْقَرْصَةِ. (ترمذى)

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ শহীদ তার নিহত হওয়ার সময় কাউকে চিমটি কাটলে যতটুকু ব্যাথা পায়, তার চেয়ে বেশী ব্যাথা পায় না। (তিরমিযী)

عَـنْ كَعْـبِ بْـنِ مَـالِكٍ (رض) اَنَّ رَسُـوْلَ اللّٰـهِ (صلعم) قَـالَ: اِنَّ اَرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ فِىْ اَجْوَافِ طَيْرٍ خُضْرٍ تَعْلُقُ مِنْ ثَمَرِ الْجَنَّةِ، اَوْ شَـجَرِ الْجَنَّةِ (ترمذى)

অর্থ ঃ হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ শহীদগণের আত্মা এক শ্রেণীর সবুজ পাখির পেটের মধ্যে অবস্থান করবে, যারা জান্নাতের উঁচু উঁচু গাছের ফল খেয়ে বেড়াবে। (তিরমিযী)

عَنْ اَبِيْ الدَّرْدَاءِ (رض) قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صلعم) يَقُوْلُ : اَلشَّهِيْدُ يَشْفَعُ فِىْ سَبْعِيْنَ مِنْ اَهْلِ بَيْتِهِ، (ابوداود، حبان)

অর্থ ঃ হযরত আবু দারদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ শহীদ ব্যক্তিকে তার পরিবারের সত্তরজনের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দেয়া হবে। (আবু দাউদ, ইবনে হাব্বান)

وَلَنَبْلُوَنَّكُـمْ بِشَـئٍ مِّـنَ الْخَـوْفِ وَالْجُـوْعِ وَنَقْـصٍ مِّـنَ الْاَمْـوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ (ط) وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ.

অনুবাদ

"আমি (আল্লাহ) তোমাদিগকে কোন কিছুর ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, (তোমাদের) জীবন, ফলমূল ও ফসলাদির ক্ষয়ক্ষতি দিয়ে অবশ্যই পরীক্ষা করি। আর আপনি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দান করুন।"

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ ঃ তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হবে। পরীক্ষার ধর্ম হলো প্রশ্ন পত্র যথা সময় প্রকাশ করা ও প্রদান করা। কিন্তু মু'মিনদের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পূর্বে প্রদান করার হিকমত বা রহস্য কি? এর উত্তরে বলা যায়-

ক. এতে পূর্ব প্রস্তুতি থাকে এবং পরিস্থিতি মোকাবেলায় নিজেকে সজাগ রাখা যায়;

খ. এতে করে পরীক্ষাটিকে মুমিনরা আল্লাহর গযব মনে করবে না;

গ. এতে মু'মিনদের ধৈর্যধারণ সহজ হয়। নচেৎ হঠাৎ করে পরীক্ষা এলে দীনের ওপর টিকে থাকা কঠিন হত;

ঘ. কি ধরনের পরীক্ষার সম্মুখিন হতে হবে তা পূর্বে জানা থাকলে সে বিষয় প্রস্তুতি নেয়া মু'মিনদের জন্য সহজ হবে। (বয়ানুল কুরআন)

যে সকল বিষয় পরীক্ষা করা হবে ঃ আল্লাহ তা'য়ালা যে সকল বিষয় পরীক্ষা নেয়ার কথা উল্লেখ করেছেন তা হল-

اَلْخَوْفُ ঃ ভয়-ভীতি। বিপদ আসবে না বটে, তবে বিপদের সম্মুখীন করে ভয় দেখানো হবে।

اَلْجُوْعُ ঃ ক্ষুধা। অর্থাৎ খাদ্যাভাব ও খাদ্যঘাটতি ইত্যাদির মাধ্যমে পরীক্ষা।

نَقْصُ الْمَالِ ঃ ধন সম্পদের ক্ষতি। বন্যা-খরা ও আগুন লেগে পুড়ে যাওয়া ইত্যাদি।

نَقْصُ الْاَنْفُسِ ঃ জীবনের ক্ষতি। জিহাদের ময়দানে নিহত হওয়া, আত্মীয় স্বজনের অপ্রত্যাশিত মৃত্যু, রোগ-ব্যাধি ইত্যাদি।

نَقْصُ الثَّمَرَاتِ ঃ ফল-ফসলের ক্ষতি। যেমন- অতি বৃষ্টি, অতি খরা ইত্যাদির মাধ্যমে ফল-ফসল নষ্ট হওয়া ইত্যাদি।

اَلَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ (১) قَالُوْا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ.

অনুবাদ

"(ধৈর্যশীলগণ) তারা-যাদের ওপর যখনই কোন বিপদ আপতিত হয় তখন বলে, "নিশ্চয় আমরা আল্লাহরই এবং অবশ্যই আমরা তাঁর নিকট ফিরে যাবো।"

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

ঈমানদার ব্যক্তির ওপর কোন মুসিবত আসলে বলে-"ইন্নালিল্লাহি অইন্নাইলাইহি রাজিউন।" আমরা আল্লাহর এবং আমাদেরকে আল্লাহর দিকেই ফিরে যেতে হবে-এ কথার অর্থ হচ্ছে, চিরকাল এ দুনিয়ায় থাকা যাবে না। এক দিন না একদিন এ দুনিয়া ছেড়ে যেতে হবে। অতএব দুর্ঘটনায় শিকার হয়ে বা রোগে-শোকে মৃত্যুবরণ না করে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে শহীদ হওয়াই ভাল।

اُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ، وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ.

অনুবাদ

"এরাই হচ্ছে তারা যাদের ওপর তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে দয়া ও করুণা অবতীর্ণ হয়। আর এরাই সৎপথ প্রাপ্ত।"

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

যে সকল ঈমানদার ব্যক্তিগণ ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থী হয়, তারই পথে জিহাদ করে এবং বিপদ-মুসিবতে আল্লাহর কর্তৃত্ব স্বীকার করে তাদের ওপর তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে দয়া ও করুণা অবতীর্ণ হয়। আর এরাই সৎপথের অধিকারী।

শিক্ষা ঃ

১. সবর ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট সাহায্য কামনা করতে হবে।

২. শাহাদাতের মর্যাদায় উজ্জীবিত হয়ে কাজ করতে হবে।

৩. সকল পরীক্ষায় চরম ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে।

৪. ঈমানদার ব্যক্তির ওপর কোন মুসিবত আসলে 'ইন্নালিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রাজিউন' পড়তে হবে।

৫. আল্লাহর বিধান অনুসরণ করলেই সৎপথের অধিকারী হওয়া যাবে।

৪

কুরআনের মাস রামাদান

২.সূরা আল-বাকারা

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ২৮৬, রুকু-৪০

আলোচ্য আয়াত ঃ ১৮৩-১৮৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি।

(١٨٣) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ (١٨٤) اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ (ط) فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ(ط) وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ (ط) فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌلَّهٗ (ط) وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌلَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (١٨٥) شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ (ج) فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ (ط) يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (ز) وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَاهَدٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (১৮৩) হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর রোয়া ফরয করা হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের অনুসারীদের ওপর ফরয করা হয়েছিল। এ থেকে আশা করা য়ায়, তোমাদের মধ্যে তাকওয়ার গুণাবলী সৃষ্টি হয়ে যাবে। (১৮৪) রোযা-তো গোনা কয়েকটি দিন। আর এ সময়ের মধ্যে তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তি অসুস্থ্ হয়ে পড়বে কিংবা সফররত থাকবে তাকে (রোয়া ভাঙ্গার) হিসেবমত (রমযান মাস ছাড়া) অন্যান্য দিনে তা পালন করতে হবে। আর যারা রোযা রাখতে সক্ষম নয়, তাদের ওপর ফিদিয়া আদায় করা অবশ্যক। তা হচ্ছে (প্রত্যেক রোযার জন্য) একজন মিসকিনকে (দু'বেলা) খাদ্য খাওয়ানো। অতপর যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ও সানন্দে কিছু বেশী সৎকাজ করে, তা তার জন্য কল্যাণকর । বস্তুতঃ সফর অবস্থায় রোযা রাখাটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা তা বুঝ। (১৮৫) 'রমযান মাস' এমাসেই কুরআন নাযিল করা হয়েছে, যা মানব জাতির জন্য পুরোপুরি হিদায়াত এবং এমন দ্বার্থহীন শিক্ষা সম্বলিত, যা সত্য-সঠিক পথ দেখায় এবং হক ও বাতিলের পার্থক্য সুস্পষ্ট করে দেয়। কাজেই, তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তি এই মাসে উপনীত হবে অবশ্যই, সে এ মাসে রোযা রাখবে এবং যে ব্যক্তি অসুস্থ্ হবে অথবা সফর অবস্থায় থাকবে, সে যেন অন্য দিনগুলোয় রোযার সংখ্যা পূর্ণ করে। আল্লাহ তোমাদের ক্ষেত্রে (বিধান) সহজ করতে চান; তিনি তোমাদের ব্যাপারে (বিধান) কঠিন করতে চান না। আর সহজকরণ এজন্য যে, তোমরা যাতে (রোযা ভাঙ্গার) হিসাবটা পুরা করতে পার এবং আল্লাহর মহিমা প্রকাশ করতে পার, ঠিক সেভাবে, যেভাবে তিনি তোমাদেরকে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। আর যাতে তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার।

শব্দার্থ ঃ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ঃ হে ঈমানদারগণ! كُتِبَ ঃ ফরয করা হয়েছে। عَلَيْكُمْ ঃ তোমাদের ওপর। اَلصِّيَامُ ঃ রোয়া। كَمَا كُتِبَ ঃ যেমনিভাবে ফরয করা হয়েছিল। عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ ঃ যারা তোমাদের পূর্বে ছিল তাদের ওপর لَعَلَّكُمْ ঃ যাতে তোমরা। تَتَّقُوْنَ ঃ মুত্তাকী হতে

পার। أَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ঃ গোনা কয়েক দিন। فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ ঃ অতপর তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তি হয়ে পড়বে। مَرِيْضًا ঃ অসুস্থ। أَوْ ঃ অথবা। عَلٰى سَفَرٍ ঃ সফররত থাকবে। فَعِدَّةٌ ঃ তবে তাকে পালন করতে হবে। مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ঃ অন্য দিনে। وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ ঃ আর যারা রোযা রাখতে সক্ষম নয় তাদের ওপর আবশ্যক। فِدْيَةٌ ঃ ফিদিয়া। طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ঃ নিঃস্বদের খাদ্য দান। فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا ঃ আর যে ব্যক্তি ভাল কিছু করবে। فَهُوَ ঃ তবে তা। خَيْرٌلَّهُ ঃ তার জন্য কল্যাণকর হবে। وَاِنْ تَصُوْمُوْا ঃ অনন্তর তোমাদের রোযা রাখা। خَيْرٌلَّكُمْ ঃ তোমাদের জন্য অতীব কল্যাণকর। اِنْ كُنْتُمْ ঃ যদি তোমরা। تَعْلَمُوْنَ ঃ বুঝতে পার। شَهْرُ رَمَضَانَ ঃ রমযান মাস। الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ ঃ যাতে অবতীর্ণ করা হয়েছে। الْقُرْاٰنُ ঃ কুরআন। هُدًى ঃ পথ প্রদর্শক স্বরূপ। لِّلنَّاسِ ঃ মানুষের। وَبَيِّنٰتٍ ঃ এবং সুস্পষ্ট প্রমানাদিরূপে। مِّنَ الْهُدٰى ঃ যাবতীয় হিদায়েতের। وَالْفُرْقَانِ ঃ এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয়কারী। فَمَنْ ঃ অতঃপর যে ব্যক্তি। شَهِدَ مِنْكُمُ ঃ তোমাদের মধ্য হতে উপস্থিত থাকবে। الشَّهْرَ ঃ এই মাস। فَلْيَصُمْهُ ঃ তবে সে যেন অবশ্যই এ মাসে রোযা রাখে। وَمَنْ كَانَ ঃ আর যে ব্যক্তি হবে। مَرِيْضًا ঃ অসুস্থ। أَوْ عَلٰى سَفَرٍ ঃ অথবা ভ্রমণরত থাকবে। فَعِدَّةٌ ঃ তবে তাকে হিসেব পূর্ণ করতে হবে। مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ঃ অন্য দিনে। يُرِيْدُ اللّٰهُ ঃ আল্লাহ চান। بِكُمُ الْيُسْرَ ঃ তোমাদের ক্ষেত্রে সহজ করতে হওয়া। وَلَا يُرِيْدُ ঃ এবং তিনি চান না। بِكُمُ الْعُسْرَ ঃ তোমাদের ক্ষেত্রে কোন কাজ কঠিন হওয়া। وَلِتُكْمِلُوا ঃ এবং যাতে তোমরা পূরণ করতে পার। الْعِدَّةَ ঃ দিনগুলোর হিসাব। وَلِتُكَبِّرُوْا ঃ যাতে মহিমা প্রকাশ করতে পার। اللّٰهَ ঃ আল্লাহর। عَلٰى مَاهَدٰكُمْ ঃ ঠিক সেভাবে যেভাবে তিনি তোমাদের পথ দেখিয়েছে। وَلَعَلَّكُمْ ঃ আর যাতে তোমরা। تَشْكُرُوْنَ ঃ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার।

আয়াতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ.

অনুবাদ

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর রোয়া ফরয করা হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের অনুসারীদের ওপর ফরয করা হয়েছিল।"

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

ঈমানদার লোকদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে তোমাদের ওপর রোয়া ফরয করা হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের অনুসারীদের ওপর ফরয করা হয়েছিল। রোযা স্বভাবতই কষ্টকর ইবাদত। যা মানুষকে খাদ্য, পানীয় ও স্ত্রী সহবাসের মত জৈবিক আকর্ষণীয় ভোগ বিলাস থেকে বিরত রাখে। হঠাৎ করে এমন একটি কাজ সকলের পক্ষেই কঠিন বলে মনে হবে। কিন্তু যদি একথা বলা হয় যে, তোমাদের পূর্ববর্তী সকল জাতির ওপর এ রোযা ফরয ছিল; তারাও এভাবে রোযা পালন করেছে, তবে একটু ভরসা পাওয়া যায় এবং বুকের মধ্যে সাহস সঞ্চারিত হয়। এর দ্বারা যেমন রোযার বিশেষ গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে, তেমনি মুসলমানদের এ মর্মে একটা সান্তনাও দেয়া হয়েছে। তাই মু'মিনদের মনে সাহস সৃষ্টি ও রোযা পালনের প্রতি তাদের উৎসাহ প্রদানের জন্য আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতের উল্লেখ করেছেন।

রোযা

সাওম অর্থ ঃ (صَوْمٌ) শব্দটি আরবী । ফার্সীতে সাওমকে রোযা বলা হয়। বাংলা ও উর্দু ভাষায় তা বহুল প্রচলিত। (صَوْمٌ) অর্থ বিরত থাকা, কঠোর সাধনা, অবিরাম প্রচেষ্টা, আত্মসংযম ইত্যাদি। যাবতীয় কাজ ও কথা থেকে বিরত থাকাকে অভিধানে সাওম বলে। (মিসবাহুল মুনীর ঃ ৩৫২)

শরীয়াতের পরিভাষায় ঃ সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আল্লাহর নৈকট্য

অর্জনের নিযতে পানাহার ও স্ত্রী গমন থেকে বিরত থাকাকে সাওম বলে। রোযা পালনকারীকে মিথ্যা কথা, মিথ্যা কাজ এবং পরনিন্দা ইত্যাদি নিকৃষ্ট কাজ থেকেও বিরত থাকতে হয়। আল্লামা জুরযানী (র) বলেন ঃ

هُوَ الْاِمْسَاكُ عَنِ الْاَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ مِنَ الصُّبْحِ اِلَى الْمَغْرِبِ مَعَ النِّيَّةِ.

"নিয়ত সহকারে সুবহে সাদেক থেকে মাগরিব পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী গমন থেকে দূরে থাকাকে সাওম বলে।" মু'জামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন ঃ

هُوَ اِمْسَاكٌ عَنِ الطَّعَامِ والشَّرَابِ مِنْ طُلُوْعِ الْفَجْرِ اِلٰى غُرُوْبِ الشَّمْسِ مَعْ النِّيَّةِ.

"নিয়ত সহকারে সুবহে সাদেক থেকে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত পানাহার থেকে বিরত থাকাকে সাওম বলে।

সাওম ফরয হওয়ার সময়-কাল ঃ হযরত মুহাম্মদ (স) মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় উপনীত হলেন তখন তিনি আশুরার রোযা পালন করেন এবং সাহাবীগণকে তা পালন করার নির্দেশ দেন। অতঃপর দ্বিতীয় হিজরীর শাবান মাসে রমযানের রোযা ফরয হয়। রমযানের রোয়া ফরয হওয়ার পূর্বে 'আশুরার' রোযা ফরয ছিল। হিজরতের পর 'আইয়ামুল বিয' এর রোযা ফরয করা হয়েছে। এরপর রমযান মাসের রোযা ফরয হওয়ায় 'আশুরার' ও 'আইয়ামুল বিযের' রোযা মানসুখ হয়ে গিয়েছে। উহা এখন সুন্নাতরূপে পরিগণিত।

সাওমের গুরুত্ব

সকল ইবাদতের মধ্যে রোযার ফযীলত অনেক বেশী। এ ইবাদতের সমতুল্য কোন ইবাদত নেই। এ প্রসঙ্গে মহানবী (স) বলেন ঃ

عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَاِنَّهُ لاَمِثْلَ لَهُ. (نسائی)

"তুমি রোযা রাখ, রোযার সমতুল্য কোন ইবাদত নেই।" (নাসায়ী)

اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ. (مسلم)

"রোযা ঢাল স্বরূপ-" (মুসলিম)

ঢাল যেমনি শত্রু আক্রমন থেকে মানুষকে রক্ষা করে রোযা তেমনি দুনিয়াতে গুণাহ থেকে এবং আখিরাতে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করে।

হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন ঃ আদম সন্তানের প্রতিটি নেক কাজের জন্য ১০ থেকে ৭শ পর্যন্ত সওয়াব বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু আল্লাহ বলেন, রোযা এর ব্যতিক্রম। ইহা একমাত্র আমার জন্য এবং আমিই নিজ হাতে এর পুরস্কার দেবো। রোযা পালনে আমার বান্দাহ আমার সন্তোষ বিধানের জন্য স্বীয় ইচ্ছা বাসনা ও নিজের পানাহার পরিত্যাগ করে থাকে।

রোযাদারের রয়েছে ২টি আনন্দ। একটা হচেছ ইফতারের সময় এবং অন্যটি হচ্ছে আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সময়। আল্লাহর কাছে রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ মেশক আতরের সুঘ্রাণের চেয়েও অনেক উত্তম। আর রোযা ঢাল স্বরূপ। তোমাদের একজন যখন রোযা রাখবে তখন যেন সে বেহুদা ও অশ্লীল কথাবার্তা না বলে এবং চীৎকার ও হট্টগোল না করে। অন্য কেউ যদি তাকে গালাগাল করে কিংবা তার সহিত ঝগড়া বিবাদ করতে আসে, তখন সে যেন বলেঃ আমি রোযাদার। (বুখারী, মুসলিম)

আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। রাসূল (স) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে একটি রোযা রাখে, তার একদিনের রোযার বদৌলতে আল্লাহ তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে সত্তর বছরের দূরত্বে সরিয়ে রাখেন। (বুখারী, মুসলিম)

আল্লাহর নিকট রোযাদারের মর্যাদা

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه (صلعم) مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَاتَاَخَّرَ. (بخارى،مسلم،ترمذى)

"হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ হযরত রাসূল (স)

ঘোষণা করেছেন, যে লোক রমযান মাসে রোযা রাখবে ঈমান ও ইহতেসাবের সাথে তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গুনাহ্ মাফ হয়ে যাবে।" (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صلعم) اِنَّ فِيْ الْجَنَّـةِ بَابًـا يُقَالُ لَهُ الرَّيَانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ تَدْخُلُ مَعْهُمْ اَحَدٌ غَيْرُ هُمْ يُقَالُ اَيْنَ الصَّائِمُوْنَ فَيَدْخُلُوْنَ مِنْهُ فَاِذَا دَخَلَ اٰخَرُهُمْ اُغْلِقَ فلَمْ يَدْخُلُ مِنْهُ اَحَدٌ. (بخارى، مسلم)

"হযরত সাহল ইবনে সা'য়াদ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূল (স) বলেছেন ঃ বেহেশতে একটি দরজা আছে, উহাকে 'রাইয়ান' বলা হয়। এ দরজা দিয়ে কিয়ামতের দিন একমাত্র রোযাদারগণই বেহেশতে প্রবেশ করবে। রোযাদার ছাড়া অন্য কেহ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না, সেদিন এ বলে ডাকা হবে, রোযাদারগণ কোথায়? তারা যেন এ পথ দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করে। এভাবে সকল রোযাদারগণ ভিতরে প্রবেশ করার পর দরজাটি বন্ধ করে দেয়া হবে। অতঃপর এ পথে আর কেহই প্রবেশ করবে না।" (বুখারী, মুসলিম)

রাসূল (স) বলেন ঃ আমার উম্মতকে আল্লাহ্ তা'য়ালা পাঁচটি জিনিস দান করেছেন, যা আমার পূর্বে কোন নবীকে দান করা হয়নি।

১. রমযান মাসের প্রথম রাতে আল্লাহর দৃষ্টিপাত। যার ওপর এ দৃষ্টি পড়বে তাকে শাস্তি দেবেন না।

২. জান্নাতকে সজ্জিত হওয়ার নির্দেশ। যাতে সেখানে রোযাদারগণ আরাম আয়েশে থাকতে পারেন।

৩. রমযানের শেষ রাতে ক্ষমা।

৪. শবে কদরের রাত যা হাজার মাসের চেয়ে উত্তম।

৫. রোযা শেষে শ্রমিকদের ন্যায় পূর্ণ মজুরী দান; তা হচ্ছে ক্ষমা। (বাইহাকী)

"হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত। রাসূল (স) বলেছেন ঃ রোযা ও কুরআন রোযাদার বান্দাহর জন্য সুপারিশ করবে। রোযা বলবে, হে আল্লাহ! আমিই এ লোকটির রোযার দিনগুলোতে খানা-পিনা যৌন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা হতে বিরত রেখেছি। অতঃএব, তুমি এর জন্য আমার সুপারিশ কবুল কর। আর কুরআন বলবে ঃ হে আল্লাহ! আমি তাকে রাতের বেলা নিদ্রামগ্ন হতে (কুরআন অধ্যয়নের কারণে) বাধা দান করেছি। অতঃএব, তুমি এর জন্য আমার সুপারিশ কবুল কর।" অতঃপর এ দু'টি জিনিসের শাফায়াত কবুল করা হবে। (আহমদ, তাবরানী, হাকেম)

রোযার ফযীলত হাদীসের অংশ থেকে

১. রোযা মানুষের মধ্যে তাকওয়া সৃষ্টি করে।

২. রোযা কিয়ামতের কঠিন দিনে বান্দার জন্য সুপারিশ করবে।

৩. রোযাদারের সম্মানে বেহেশতের 'রাইয়ান' নামক একটি বিশেষ দরজা খোলা হবে। এ দরজা দিয়ে তারা বেহেশতে প্রবেশ করবে।

৪. রোযাদার ইফতার না করা পর্যন্ত ফেরেশতারা তার জন্য গুনাহ মাফের দুআ করতে থাকে।

৫. রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে মেশকের সুগন্ধের চেয়েও উত্তম।

৬. ইফতারের সময়রোযাদারের দুআ কবুল করা হয়।

৭. রমযান মাসে বড় বড় শয়তানদেরকে শৃঙ্খলিত করা হয়।

৮.রমযান মাসে বেহেশতের দরজা খুলে দেয়া হয় এবং দোজখের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়।

৯ রমযান মাসে কদরের রাত রয়েছে যা হাজার মাসের চেয়ে উত্তম।

১০. তারাবীর নামাযে অধিক সওয়াব লাভ করা যায়।

১১.এমাসে নফল এবাদত ফরযের সমান এবং ১টি ফরয এবাদত অন্য মাসের ৭০টি ফরযের সওয়াবের সমান।

১২. রমযান মাসে এমন একটি রাত রয়েছে- যে রাতে এবাদত করলে হাজার মাসের অধিক সওয়াব পাওয়া যায়।

১৩. রোযার প্রতি রাতে রোযাদার মু'মিনদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেয়া হয়। শেষ পর্যন্ত মাসের শেষ রাতে পুরা মাসের সমান সংখ্যক লোককে মুক্তি দেয়া হয়।

১৪. রোযাদারের জন্য সমুদ্রের মাছ পর্যন্ত দো'আ করতে থাকে এমনকি ইফতারের সময় পর্যন্ত।

১৫. প্রতিদিন জান্নাতকে রোযাদারের জন্য সুসজ্জিত করা হয়। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন ঃ আমার নেক বান্দাগণ দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট পশ্চাতে রেখে অতি শীঘ্রই আমার কাছে আসবে।

১৬. অপর হাদীসে বলা হয়েছে ঃ রমযান মাসে যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করাবে, তার এ কাজ তার গুনাহ মাফ এবং জাহান্নামের আগুন থেকে তাকে বাঁচাবার কারণ হবে। এ রোযাদারের রোযা রাখায় যত সওয়াব হবে তাতে তারও ঠিক ততখানি সওয়াব হবে। তাতে রোযাদারের সওয়াব একটুকুও কম হবেনা।

১৭. রমযান মাসের প্রথম ১০ দিন রহমতের মাঝের ১০ দিন ক্ষমার এবং শেষের ১০ দিন জাহান্নাম থেকে মুক্তির।

১৮. রমযান মাস কুরআন নাযিলের মাস। এ মাসেই পবিত্র কুরআন নাযিল হয়েছে।

১৯. রমযান মাস সবর ও ধৈর্যের মাস।

২০.রমযানে রোযা রাখার জন্য সেহরী খেতে হয়। আর এতে আল্লাহ বরকত দান করেন।

২১. রমযান মাস মুসলমানদের বিজয়ের মাস।

عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ ঃ যারা তোমাদের পূর্বে ছিল,–ব্যাপক অর্থবোধক। এর দ্বারা হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে হযরত ঈসা (আ) পর্যন্ত সকল উম্মত এবং শরীয়তকেই বোঝায়। এতে বোঝা যায় যে, নামাযের এবাদত থেকে যেমন কোন উম্মত বা শরীয়তই বাদ ছিল না, তেমনি রোযাও সবার জন্যই ফরয ছিল। তবে সময়সীমা সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য

থাকলেও রোযার শর্ত ও প্রকৃতি একই ছিল। রোযার ঐতিহাসিক পটভূমি থেকে সে কথা জানা যায় ঃ

রোযার ঐতিহাসিক পটভূমি ঃ গুনিয়াতুত তালিবীন গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, হযরত আদম (আ) ও হাওয়া (আ)-কে সৃষ্টি করে জান্নাতে বসবাস করার সুযোগ দান করলেন এবং বললেন তোমারা দু'জনে চরম সুখে বসবাস কর; কিন্তু নিষিদ্ধ গাছের কাছে যেয়ো না। হযরত আদম (আ) ও মা হাওয়া (আ) শয়তানের ধোকায় পড়ে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেলেন এবং আল্লাহর হুকুম অমান্য করার কারণে তাদেরকে দুনিয়ায় পাঠালেন। নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ার কারণে আদম (আ)-এর দেহের রং কাল হয়ে যায়। তখন ফিরিশতাগণ আল্লাহর কছে আদমের দেহের রং পূর্বের ন্যায় পরিবর্তনের জন্য প্রার্থনা করেন তখন আল্লাহ তা'য়ালা চান্দ্রমাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ রোযা রাখার নির্দেশ দিয়ে অহী পাঠালেন। আদম (আ) অহী অনুযায়ী রোযা রাখলেন এতে তার গায়ের রং উজ্জ্বল হল। এ কারণে এ তিন দিনকে 'আইয়ামে বীয' বা উজ্জ্বল দিবস বলা হয়। তাই একথা বলা যায় যে, দুনিয়ার প্রথম মানুষ আদম (আ) প্রথম রোযা পালনকারী ছিলেন।

পূর্ববর্তী নবীগণের যুগে রোযা

১. পূর্ববর্তী উম্মতগণের ওপর প্রতি মাসে তিন দিন করে রোযা ফরয ছিল। (তাফসীরে ইবনে কাসীর)

২. হযরত নূহ (আ)-দুই ঈদের দিন ব্যতীত সারা বছর রোযা রাখতেন। (ইবনে মাযাহ)

৩. হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর যুগে রোযা রাখার বিধান চালু ছিল।

৪. হযরত মুসা (আ) চল্লিশ দিন রোযা রাখার পর আল্লাহর ওহী পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন।

৫. আশুরার দিন আল্লাহ তা'য়ালা ফিরাউন ও তার দলবলকে নীল নদে ডুবিয়ে হত্যা করেন এবং বণী ঈসরাঈল সম্প্রদায়কে ফিরাউনের কবল

থেকে মুক্তি দান করেন এর শুকরিয়া স্বরূপ মুসা (আ) এ দিনে রোযা পালন করতেন। (বুখারী)

৬. হযরত ঈসা (আ) চল্লিশ দিন ধরে রোযা রেখেছিলেন এবং তাঁর শিষ্যদের মধ্যেও চল্লিশ দিন রোযা রাখার নির্দেশ প্রদান করেছিলেন। (মাথু, পৃ ঃ ১৬)

৭. হযরত দাউদ (আ) আল্লাহর প্রিয় বান্দা ও রাসূল ছিলেন। তাঁর উপর 'যবুর' কিতাব অবতীর্ণ করেন। তাঁর রোযা ছিল আল্লাহর নিকট পছন্দনীয়। তিনি এক দিন পর এক দিন করে বছরে মোট ছয় মাস রোযা রাখতেন। (বুখারী)

৮. হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মের পরে কৌতূহলী জনগণ হযরত মরিয়ম (আ)-কে হযরত ঈসা (আ)-এর জন্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাস করলে তিনি উত্তরে বললেন ঃ

فَقُوْلِىْ اِنِّىْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا.

"আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে মানতের রোযা রেখেছি। সুতরাং আজ আমি কিছুতেই মানুষের সাথে কোন কথা বলবো না।" (সূরা মরিয়ম ঃ ২৬)

আইয়ামে জাহিলিয়াতে রোযা ঃ হযরত ঈসা (আ)-এর পর থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর নবুয়ত লাভ করার পূর্ব পর্যন্ত সময়কে আইয়ামে জাহিলিয়াতের যুগ বলা হয়। এ সময় ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান ও মুশরিকরা বিভিন্নভাবে রোযা পালন করত। বিশেষ করে মক্কার কুরাইশরা আশুরার রোযা পালন করত। (বুখারী) মুহার্‌রমের ১০ তারিখে কাবা ঘরে গিলাফ লাগান হত সে দিন আরবরা রোযা রাখত। (আহমদ)

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ঃ "যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।" রোযা মানুষের মধ্যে তাকওয়ার গুণ ও বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে। তাকওয়া মানব জাতির জন্য এক মৌলিক ও মহৎ গুণ । এ গুণ অর্জন করা প্রত্যেকটি মু'মিনের কর্তব্য। কারণ মুত্তাকী হওয়া ছাড়া আল্লাহ তা'য়ালার নাযিলকৃত পবিত্র আসমানী কিতাব আল কুরআনের হিদায়েত পাওয়া যাবে না। আল্লাহ্ বলেন ঃ

ذَالِكَ الْكِتَابُ لاَرَيْبَ فِيْهِ، هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ.

"ইহা এমন এক গ্রন্থ যার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। ইহা কেবল মাত্র মুত্তাকী লোকদের জন্য পথ প্রদর্শক।" (বাকারা ঃ ২-৩)

তাকওয়া অর্থ ঃ তাকওয়া আরবী শব্দ । এর আভিধানিক অর্থ–ভয় করা; বিরত থাকা; আল্লাহ ভীতি; বেছে চলা; আত্ম শুদ্ধি; রক্ষা করা; সতর্কতা অবলম্বন করা ইত্যাদি ।(আল-ওয়াসীত)

শরীয়তের পরিভাষায় ঃ একমাত্র আল্লাহ্‌র ভয়ে সকল প্রকার অন্যায় ও অসৎ কাজ থেকে নিজকে বিরত রেখে কুরআন সুন্নাহ মোতাবেক জীবন পরিচালনার নামই তাকওয়া।

তাকওয়া সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষীদের অভিমত

হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) বলেছেন ঃ তাকওয়ার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর আদেশের আনুগত্য করা। তাঁর নাফরমানী না করা, আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা, তাকে ভুলে না যাওয়া এবং আল্লাহ্‌র শোকরিয়া আদায় করা ও তাঁর কুফরী না করা।

হযরত ওমর বিন আবদুল আযিয বলেছেন ঃ দিনে রোযা রাখা কিংবা রাত্রে জাগরণ করা অথবা দু'টোর আংশিক আমলের নাম তাকওয়া নয়; বরং তাকওয়া হচ্ছে আল্লাহ যা ফরয করেছেন তা পালন করা এবং তিনি যা হারাম করেছেন তা থেকে দূরে থাকা।

প্রখ্যাত তাবেঈ তালাক বিন হাবিব বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র প্রতি তাকওয়ার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্‌র আলোর রোশনীতে তাঁর হুকুমের আনুগত্য করা ও সওয়াবের আশা করা এবং আল্লাহ্‌র শাস্তিকে ভয় করে তাঁর নাফরমানী ত্যাগ করা।

একদা কোন এক ব্যক্তি হযরত উমার (রা) এর দরবারে হাজির হয়ে তাকওয়ার অর্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন ঃ তুমি কি কোন সময় বনের কন্টকাবৃত রাস্তা দিয়ে চলেছ? লোকটি জবাব দিলেন হ্যাঁ, তাহলে রাস্তা দিয়ে কি ভাবে চলেছ? বললেন কাপড়ের আচঁল সামলিয়ে পার হয়ে যাই।

হযরত উমার (রা) বলেন ঃ বস্তুত তাকওয়ার অর্থ এটাই যে, তোমরা পার্থিব জীবন এমন ভাবে অতিক্রম করবে যাতে করে জীবন পোশাকের আঁচল ও এখানকার কন্টকাকীর্ণ না হয়। আর আল্লাহর নিকট তাকওয়ার মর্যাদাই একমাত্র মৌলিক মর্যাদা।

তাকওয়া বা খোদাভীতির স্তর তিনটি। যথা–

১। শির্ক হতে বিরত থাকার মাধ্যমে নির্দিষ্ট শাস্তি হতে আত্ম রক্ষা করা।

২। গুণাহ থেকে দূরে থাকা।

৩। এমন কাজ থেকে দূরে থাকা, যা আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করে দেয়।

মুত্তাকীদের পরিচয়

যারা অন্যায়, অত্যাচার ও যাবতীয় পাপকার্য হতে নিজেদের কলুষমুক্ত রাখার জন্য সদা জাগ্রত ও সতর্ক। সততা, আমানতদারী, ধৈর্য, শোকর, আদল প্রভৃতি সকল প্রকার অনুপম চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী। যারা শরয়ী আহকাম সর্ম্পকে সম্যক জ্ঞান রাখেন ও তদানুযায়ী আমল করেন। যারা নিজেরা সৎ কাজ করেন অন্যদেরকে সৎকাজের আদেশ দেন এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখেন। যে ব্যক্তির মধ্যে তাকওয়ার গুণাবলীর সমাহার ঘটে তাকে মুত্তাকী বলা হয়।

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, "যে ব্যক্তি শিরক, কবীরাহ গুণাহ ও অশ্লীল বাক্য হতে নিজেকে বিরত রাখে তাকে মুত্তাকী বলা হয়।" মহান রব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে মুত্তাকীদের প্রাথমিক পরিচয় সম্পর্কে ঘোষণায় বলেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُـوْنَ وَالَّذِيْـنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ–وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ.

১. গায়েব বা অদৃশ্য বিষয়াবলীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে।

২. নামায প্রতিষ্ঠা করে।

৩.আল্লাহ প্রদত্ত জীবিকা ও ধনসম্পদ হতে তারই নির্দেশিত পথে ব্যয় করে।

৪. মুহাম্মদ (স) এর প্রতি অবতীর্ন আলকুরআন এবং পূর্ববর্তী নবী রাসূলদের প্রতি অবতীর্ন আসমানী কিতাব সমূহে বিশ্বাস স্থাপন করে।

৫.পরকাল সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে।

তাকওয়ার গুরুত্ব ও তাৎপর্য

তাকওয়ার গুণ মানব চরিত্রের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। দুনিয়া ও আখেরাতের মূল ভিত্তি হচ্ছে তাকওয়া। আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিক্ষেত্রে তাক্ওয়ার প্রভাব অপরিসীম। আল্লাহ বলেন ঃ "হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যে ভাবে ভয় করা উচিত"(আলে ইমরানঃ১০২)।

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلاَدِمَائُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ.

"কুরবানির পশুর রক্ত এবং মাংস আল্লাহর দরবারে পৌঁছেনা বরং আল্লাহর দরবারে পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া।" (আলহাজ্জ ঃ ৩৭)

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْااتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَلاَ تَمُوْتُنَّ اِلاَّ وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ.

হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর; যে ভাবে ভয় করা উচিত এবং প্রকৃত মুসলমান না হয়ে মৃত্যু বরণ কর না। (আলে-ইমরান ঃ ১০২)

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ.

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা মুত্তাকীদের ভালবাসেন।" (তওবা ঃ ৪)

অন্য আর এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَاتَّقُوْا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ.

"এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আর জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীনদের সাথে রয়েছেন।" (আল-বাকারা ঃ ১৯৪)

তাকওয়ার গুণ অর্জিত হয় রোযার মাধ্যমে। একারণেই আবহমান কাল থেকে সকল নবীর উম্মতের উপর রোযা ফরয করা হয়েছিল। আর মানব জীবনে বছরে একমাস হিসেবে বালেগ হওয়ার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কমপক্ষে বার ভাগের একভাগ সময় সিয়াম-সাধনায় অতিবাহিত করতে হয়।

তাকওয়ার মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ছয়টি। যথা ঃ

১। সত্যের সন্ধান;

২। সত্য গ্রহণ;

৩। সত্যের উপর সুদৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত থাকা;

৪। আল্লাহভীতি;

৫। দায়িত্বানুভূতি;

৬। আল্লাহর নির্দেশ পালন।

এ বৈশিষ্ট্য আমাদের সকলের অর্জন করা একান্ত প্রয়োজন। তাহলেই কেবল তাকওয়াবান হওয়া যাবে।

أَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ.

অনুবাদ

"রোযা-তো গোনা কয়েকটি দিন।"

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

(ক) হযরত কাতাদাহ (রা) বলেন ঃ ইসলামের প্রথম দিকে প্রতি মাসে ৩টি রোযা ফরযে ইখতেয়ারী ছিল। ইচ্ছা করলে রোযা না রেখে ফিদিয়া দিলে রোযা আদায় হয়ে যেত। আল্লাহর বাণী ঃ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ **কাজেই** أَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ **"রোযা-তো গোনা কয়েকটি দিন।" এর দ্বারা এই ৩ দিন উদ্দেশ্য।**

(খ) مَّعْدُوْدٰتٍ **"রোযা-তো গোনা কয়েকটি দিন।" এর রমযান মাস উদ্দেশ্য। কারণ পরবর্তীতে -** فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ **বলে এক**

মাসের রোযার কথা উল্লেখ করেছেন। আর তা হল- شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ - দ্বিতীয় মত অধিক যুক্তযুক্ত।

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ.

অনুবাদ

"আর এ সময়ের মধ্যে তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়বে কিংবা সফররত থাকবে তাকে (রোয়া ভাঙ্গার) হিসেবমত (রমযান মাস ছাড়া) অন্যান্য দিনে তা পালন করতে হবে।"

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

কোন ব্যক্তি যদি রমযান মাসে এমন অসুস্থ হয়ে পড়ে যে, তার পক্ষে রোযা রাখা আদৌ সম্ভব নয় এবং কোন বিজ্ঞ ডাক্তার যদি রোযা ভঙ্গ করার ব্যাপারে পরামর্শ প্রদান করেন, তবে রুগ্ন ব্যক্তি সাময়িক ভাবে রোযা পালন থেকে বিরত থাকবে। পরবর্তীতে সময় সুযোগ মত ঐ রোযা গুলো কাযা করবে। কিন্তু রোগী ব্যক্তি আর সুস্থ না হয় এবং এ অবস্থায় মারা যায় তাহলে তার ওপর কোন ফিদিয়া বা কাফফারা বর্তাবে না।

মুসাফির ব্যক্তির বিধান অসুস্থ ব্যক্তির বিধানের অনুরূপ। যে ব্যক্তি বাড়ী থেকে অন্তত পায় হেটে তিন দিনের পথ পরিমাণ দূরে যাত্রা করে এবং কোথাও সর্বাধিক ১৫ দিনের কম সময় অবস্থানের নিয়ত করে, শরীয়তে তাকে মুসাফির বলা হয়। আমাদের ফিকহ্ শাস্ত্রবিদ মণীষীগণ সফরের ভ্রমনগত দূরত্ব ৪৮ মাইল নির্ধারণ করে দিয়েছেন। ভ্রমন অবস্থায় কোথাও ১৫ দিন অথবা ততোধিক অবস্থানের নিয়ত করলে তাকে সাময়িক মুকিম বলা হবে। ফলে তাকে অবশ্যই রোযা রাখতে হবে। এটাই ফকীহ্দের রায়। মুসাফির যদি সফরে মারা যায় তাহলে তার ওপর ফিদিয়া বা কাফফারা কিছুই আবশ্যক হবে না।

وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ. فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ. وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

অনুবাদ

"আর যারা রোযা রাখতে সক্ষম নয়, তাদের ওপর ফিদিয়া আদায় করা আবশ্যক। তা হচ্ছে (প্রত্যেক রোযার জন্য) একজন মিসকিনকে (দু'বেলা) খাদ্য খাওয়ানো। অতপর যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ও সানন্দে কিছু বেশী সৎকাজ করে, তা তার জন্য কল্যাণকর। বস্তুতঃ সফর অবস্থায় রোযা রাখাটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা তা বুঝ।"

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা), হযরত মা'য়ায ইবনে জাবাল (রা) ও ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, প্রাথমিককালে রোযা ইচ্ছাধীন ছিল। সামর্থবান ব্যক্তিও ইচ্ছা করলে রোযা না রেখে মিসকিনকে খাদ্য দান করলেই চলত। আলোচ্য আয়াতে সেই বিধানটিই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু পরবর্তীতে আল্লাহ তা'আলা فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ আয়াত অবতীর্ণ করলে পূর্ববর্তী আয়াতের হুকুম রহিত হয়ে যায় এবং সামর্থবানদের ওপর রোযা রাখা ফরয হয়ে যায়।

ইসলামের অন্যান্য বিধানের মত রোযাও পর্যায়ক্রমে ফরয হয়। শুরুতে নবী (স) মুসলমানদেরকে প্রতি মাসে মাত্র তিন দিন রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ রোযা ফরয ছিল না। তারপর দ্বিতীয় হিজরীতে রমযান মাসে রোযার এই বিধান কুরআনে নাযিল হয়। তবে এতে এতটুকুন সুযোগ দেয়া হয়, রোযার কষ্ট বরদাশত করার শক্তি থাকা সত্ত্বেও যারা রোযা রাখবে না তারা প্রত্যেক রোযার বদলে একজন মিসকিনকে আহার করাবে। পরে দ্বিতীয় বিধানটি নাযিল হয় এতে পূর্ব প্রদত্ত সাধারণ সুযোগ বাতিল করে দেয়া হয়। কিন্তু রুগী, মুসাফির, গর্ভবতী মহিলার বা দুগ্ধপোষ্য শিশুর মাতা এবং রোযা রাখার ক্ষমতা নেই এমন সব বৃদ্ধদের জন্য এ সুযোগ আগের মতই বহাল রাখা হয়। পরে ওদের অক্ষমতা দূর হয়ে গেলে রমযানের যে ক'টি রোযা তাদের বাদ পড়ে গেছে সে ক'টি রোযা পূরণ করে দেয়ার জন্য তাদের নির্দেশ দেয়া হয়।

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّـاسِ وَبَيِّنَـاتٍ مِّـنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانُ.

অনুবাদ

"রমযান এমন একটি মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কুরআন, যা মানুষের জন্যে হেদায়াত এবং সত্যপথযাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথনির্দেশ আর হক-বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী দলিল।" (আল-বাকারা ঃ ১৮৫)

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

রমযান মাসে লাইলাতুল কদরে আল্লাহ তা'য়ালা লওহে মাহফুয থেকে প্রথম আকাশে কুরআন নাযিল করেন। এরপর সেখান থেকে দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে নবী করীম (স)-এর ওপর অবতীর্ণ করা হয়েছে।

রমযান শব্দের তাৎপর্য ঃ 'রমযান' (رمضان) শব্দের মধ্যে পাঁচটি অক্ষর রয়েছে। এর প্রতিটি অক্ষর একটি অর্থ বহন করে থাকে। যেমন-'রা' অক্ষরটি দ্বারা 'রেদওয়ানুল্লাহ' মানে আল্লাহর সন্তুষ্টি, 'মীম' অক্ষর দ্বারা 'মাগফিরাতুল্লাহ' মানে আল্লাহর ক্ষমা প্রদর্শন। 'দোয়াদ' অক্ষর দ্বারা 'যিমানুল্লাহ' মানে আল্লাহর যামিন হওয়া। আর 'আলিফ' অক্ষর দ্বারা 'উলফাতুল্লাহ' মানে আল্লাহর প্রেম ও ভালবাসা এবং 'নুন' অক্ষর দ্বারা 'নিয়ামাতুল্লাহ' মানে আল্লাহর নি'য়ামত লাভ করা বুঝান হয়েছে। (গুনিয়াতুত তালেবীন)

ইতিহাসে রমযানের গুরুত্ব

১. হকের হেদায়েত অবতীর্ণ হয় ঃ ইতিহাসের পাতা থেকে একথাই প্রমাণিত হয় যে, হক বাতিলের চিরন্তণ দ্বন্দ্ব পৃথিবীর শুরু থেকেই ছিল। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পৃথিবীতে হক প্রতিষ্ঠার জন্য যুগে যুগে অগণিত নবী ও রাসূলের মাধ্যমে আসমানী কিতাব প্রেরণ করেন। হকের দাওয়াত সম্বলিত আসমানী সকল কিতাব এ রমযান মাসেই অবতীর্ণ হয়।

نَزَلَتْ صُحُفِ اِبْرَاهِيْمَ اَوَّلَ لَيْلَةٍ مِّنْ رَمَضَانَ وَ اُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ لِسِتٍّ مَضَيْنَ وَالْاِنْجِيْلَ لِثَلَاثِ عَشْرَةَ وَالْقُرْاٰنُ لِاَرْبَعَ عِشْرِيْنَ.

"হযরত ইব্রাহীমের সহীফাসমূহ রমযান মাসের প্রথম রাতে নাযিল হয়েছে। তাওরাত কিতাব রমযানের ছয় তারিখ দিবাগত রাতে, ইঞ্জিল এ মাসের তের তারিখে এবং কুরআন রমযান মাসের চব্বিশ তারিখে (রাতে) নাযিল হয়।" (মুসনাদে আহমদ, তিবরানী)

এ হাদীস থেকে আমরা বুঝতে পারলাম বিশ্ব মানবতার মুক্তির সনদ ও শান্তির পয়গাম অবতীর্ণের সাথে রমযান মাসের এক বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে।

হযরত কাতাদাহ বর্ণিত রেওয়ায়েতে রাসূল (স) বলেন ঃ "হযরত ইব্রাহীমের সহীফাসমূহ রমযান মাসের প্রথম তারিখে, তাওরাত কিতাব রমযানের ছয় তারিখে, যবুর বার তারিখে, ইঞ্জিল এ মাসের আঠার তারিখে এবং কুরআন রমযান মাসের চব্বিশ তারিখ অতিবাহিত হওয়ার পর পঁচিশের রাত্রিতে অবতীর্ণ হয়েছে। (কুরতুবী)

এ হাদীস থেকে আমরা বুঝতে পারলাম বিশ্ব মানবতার জন্য রাসূলে পাক (স) যে হিদায়াত নিয়ে এসেছে তা হচ্ছে হক-বাতিলের মধ্যে পরিপূর্ণ ও সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্ণয়কারী আলকুরআন। আর এ হকের হিদায়াত রমযান মাসেই অবর্তীণ হয়। বদর প্রান্তরে ১৭ই রমযান হক-বাতিলের পার্থক্য নির্ণয় হয় এবং হকের প্রথম বিজয় সূচিত হয়। আল-কুরআনে এই দিনকে "ইয়াওমুল ফোরকান' বলা হয়েছে। হক ও বাতিলের চিরন্তন দ্বন্দে হকের বিজয় অনিবার্য। তাই মানুষ এ হেদায়েত থেকে রমযানে দিনে সিয়াম আর রাতে কিয়ামের মাধ্যমে মুজাহিদ সুলভ তারবিয়াত গ্রহণ করতে পারে।

২. ইসলামের প্রাথমিক বিজয় ঃ পবিত্র কুরআন নাযিল হওয়ার পরে কুরআনের বিধান চালু করার জন্যে রাসূল (স) যে আন্দোলনের সূচনা করলেন সে আন্দোলনে মক্কার কাফের নেতৃবৃন্দ বাঁধার সৃষ্টি করল। বদরের প্রান্তরে রোযাদার মুসলিম মুজাহিদদের বীরত্ব ও ত্যাগ-তিতিক্ষার ফলে ইসলামের প্রাথমিক বিজয় সূচিত হয়। আর ইসলামের প্রথম বিজয় পতাকা

পৃথিবীর আকাশে উড্ডীন হয়েছিল বদরের প্রান্তরে এ মাহে রমযানেই। তাই রমযান হচ্ছে খোদাদ্রোহী তাগুতী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের মাস।

৩. ইসলামের পরিপূর্ণ বিজয়ঃ রমযান মাস দীনকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠার মাস। রাসূল (স) বদর, ওহুদ ও খন্দকের মত অগণিত যুদ্ধের পথ ধরে যেখান থেকে তিনি অতি গোপনে একজন মাত্র সাথী নিয়ে মদিনায় আশ্রয় নিয়েছিলেন সে মক্কা শহরে ৮ম হিজরী ২১শে রমযান শুক্রবার ভোর বেলা বিজয়ী বীর হিসেবে প্রবেশ করেন। তখন সমস্ত আরব তার পদানত হয় এবং আরব রাষ্ট্রে বিজয়ী শক্তি হিসেবে ইসলামের আত্মপ্রকাশ ঘটে। প্রতিবছর রমযানের আগমন ইতিহাসের সে কথাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। যাতে করে প্রত্যেকটি মুসলমান জিহাদের প্রাণ শক্তি হারিয়ে না ফেলে।

এ কুরআনের সাথে রমযান মাসের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। কুরআন ও রমযান যেন একই বৃন্তের দু'টো ফোটা ফুল যা একত্রে ফুটেছে। রমযান মাস আসলেই প্রত্যেক মু'মিনের অন্তরে কুরআন নাযিলের ইতিহাস জাগ্রত হয়। কুরআন জানা ও বুঝার জন্য রমযান মাসই হচ্ছে সব চেয়ে বড় মওসুম। রাসূল (স) এ মাসে পবিত্র কুরআন বেশী বেশী করে অধ্যয়ন করতেন ও জিবরাঈল (আ)-কে শুনাতেন এবং তিনি তার থেকে শুনতেন। তাই আমাদেরও পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে সুন্দর করার জন্যে রাসূল (স)-এর প্রদর্শিত পন্থায় কুরআনকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করা উচিত। কুরআন পরকালে অধ্যয়নকারীর জন্য সুপারিশ করে বলবে ঃ হে আল্লাহ! আমি তাকে রাত্রিকালে নিদ্রামগ্ন হতে বাধাদান করেছি। কাজেই তাহার জন্য আমার সুপারিশ কবুল কর। অতঃপর কুরআনের সুপারিশ কবুল করা হবে। (বায়হাকী)

রমযান রহমতের মাস ঃ রমযান মাস রহমতের মাস। হাদীসে এসেছে ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صلعم) اَتَـاكُمْ رَمْضَانُ شَـهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَـهُ تُفْتَـحُ فِيْـهِ اَبْـوَابُ السَّمَاءِ

وَتُغْلَقُ فَيْهِ اَبْوَابُ الْجَحِيْمِ وَتُغْلَقُ فِيْهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِيْنِ لِلّٰهِ فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حَرُمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حَرُمَ. (نسائى، بيهقى)

অর্থ ঃ হযরত আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন ঃ তোমাদের সামনে রমযান মাস সমুপস্থিত। উহা এক বরকতময় মাস। আল্লাহ তা'য়ালা এ মাসে তোমাদের প্রতি রোযা ফরয করেছেন। এ মাসে আকাশের দরজাসমূহ উম্মুক্ত হয়ে যায়, জাহান্নামের দরজা সমূহ বন্ধ করে দেয়া হয় এবং বড় বড় শয়তানগুলো আটক করে রাখা হয়। এ মাসে একটি রাত আছে, যা হাজার মাসের চেয়ে অধিক উত্তম। যে লোক এ রাতের মহাকল্যাণ লাভ করা থেকে বঞ্চিত থাকল, সে সত্যিই বঞ্চিত ব্যক্তি। (নাসাঈ, বায়হাকী)

هُوَ شَهْرٌ اَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَاَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَاٰخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ.

ইহা এমন একটি (রমযান) মাস যার প্রথম দশক 'রহমতের' দ্বিতীয় দশক 'মাগফিরাতের' ও তৃতীয় দশক জাহান্নাম থেকে 'মুক্তি' লাভের জন্য নির্দিষ্ট। (বায়হাকী)

'রমযানের প্রতিটি দিবা-নিশিতে অসংখ্য জাহান্নামবাসীকে মুক্তি দেয়া হয়; আর প্রতিটি মুসলমানের একটি করে দুআ কবুল করা হয়।'

রমযান মাসে আল্লাহর অপার রহমতের বারিধারা সকল মু'মিন বান্দার অন্তরকে সিক্ত করে তুলে। এরই মাধ্যমে তাদের ঈমানের তেজদিপ্ততা বৃদ্ধি পায়। ধন্য হয় প্রতিটি মানুষ। রমযানের রোযার ক্ষুৎ-পিপাসার কষ্ট মু'মিনদেরকে অভাবী ও দরিদ্র লোকদের দুঃখ সরাসরি অনুভব করার বাস্তব শিক্ষা দেয়। গরীবের বন্ধু হয় ধনীরা। বুঝতে পারে তাদের দুঃখ-দুর্দশা। দুঃখ লাঘব করার প্রয়াসে একত্রে কাজ করে। তাতে সমাজের মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়। এ সব কিছুই আল্লাহর রহমতের কারণে। এজন্যেই বলা হয় 'রমযান' মাস রহমতের মাস।

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ.

অনুবাদ

"তোমাদের মধ্যে যে এ মাসটি পায় সে যেন অবশ্যই তাতে রোযা পালন করে।"

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

রমযান মাসে রোযা পালন করা ফরয করা হয়েছে। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এ মাসটি পাবে তাকে অবশ্যই রোযা পালন করতে হবে।

পৃথিবীর প্রত্যেক জাতির মধ্যে এ নীতি প্রচলিত আছে যে, যখন কোন জাতি গুরুত্বপূর্ণ ও বড় ধরনের কোন সাফল্য অর্জন করে তখন তার স্মৃতি স্বরূপ সে সাফল্য অর্জনের তারিখে প্রতি বছর উৎসব পালন করে আনন্দ উদযাপন করে; তেমনিভাবে মুসলিম জাতিকে আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনের মত এত বড় এক নি'আমত দান করলেন যার স্মৃতি ধরে রাখার জন্য 'রমযান' মাসকে নির্ধারিণ করলেন এবং কুরআন অবতীর্ণের কারণেই আল্লাহ তা'য়ালা এ মাসকে রহমত, বরকত ও ক্ষমাপ্রাপ্তির মাস হিসেবে ঘোষণা করলেন। এ স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের কারণেই এ মাসের মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব ও ফযীলত এত বেশী যা অন্যান্য মাসের নেই। রমযান মাসে রয়েছে লাইলাতুল কদর যা হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। আর এ কদরের রাত রমযানের শেষ দশকের যে কোন একটি বেজোড় রাতে। কদরের রাতের মর্যাদা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ.

" কদরের রাতটি হাজার মাসের চেয়ে উত্তম।" (সূরা আল-কদর ঃ ৩)

রাসূল বলেন ঃ "রমযানের শেষ দশ রাতের বেজোড় রাতগুলোর মধ্যে লাইলাতুল কদর তালাশ কর।" (বুখারী)

وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ.

অনুবাদ

"আর এ সময়ের মধ্যে তোমাদের মাঝে যে ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে পড়বে

কিংবা সফররত থাকবে তাকে (রোয়া ভাঙ্গার) হিসেবমত (রমযান মাস ছাড়া) অন্যান্য দিনে তা পালন করতে হবে।"

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

রমযান মাসে কেউ যদি এমন অসুস্থ হয যে, সে রোযা রাখতে সম্পূর্ণভাবে অক্ষম অথবা সে সফর অবস্থায় থাকে তবে সে এ সময়ে রোযা ভাঙ্গতে পারবে। পরবর্তীতে সময় সুযোগ মত ঐ রোযাগুলো কাযা করবে।

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.

অনুবাদ

"আল্লাহ তোমাদের ক্ষেত্রে (বিধান) সহজ করতে চান; তিনি তোমাদের ব্যাপারে (বিধান) কঠিন করতে চান না।"

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

অসুস্থ অবস্থায় এবং সফর অবস্থায় রোযা রাখা থেকে বিরত থাকতে অবকাশ দেয়া হয়েছে এজন্য যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষেত্রে পালনীয় বিধানগুলোকে সহজ করতে চান; কঠিন কিছু তোমাদের ওপর চাপিয়ে দিতে চান না। কারণ, তিনি যদি তাঁর বিধান তোমাদের ওপর কঠিন করে দেন তাহলে তোমরা তা পালন করতে সক্ষম হবে না।

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَاهَدٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ.

অনুবাদ

"তোমরা যাতে (রোযা ভাঙ্গার) হিসাবটা পুরা করতে পার এবং আল্লাহর মহিমা প্রকাশ করতে পার, ঠিক সেভাবে, যেভাবে তিনি তোমাদেরকে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। আর যাতে তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার।"

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

আর আল্লাহ তাঁর বিধান এ জন্য সহজ করেছেন যে, যাতে তোমরা ছুটে

যাওয়া সবকটি রোয়া পূর্ণ করতে পার। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়ে যে অনুগ্রহ করেছেন সেজন্য তাঁর মহত্ত্ব ঘোষণা করতে পার। আর যাতে তোমরা আল্লাহর এই অশেষ নি'আমতের শুকরিয়া আদায় করতে পার।

শিক্ষা

১. রোযা উম্মাতে মুহাম্মাদীর ওপর ফরয করা হয়েছে।

২. রোয়া ফরয করার উদ্দেশ্য হচ্ছে তাকওয়া অর্জন করা।

৩. রমযান মাসে কেহ অসুস্থ বা সফরে থাকলে রোযা ভাংতে পারবে।

৪. রমযানের পরে ছুটে যাওয়া রোযার কাযা আদায় করতে হবে।

৫. রমযান মাসেই পবিত্র কুরআন নাযিল করা হয়েছে।

৬. কুরআনই হচ্ছে মানব জাতির জন্য একমাত্র হিদায়াত।

৭. কুরআন হক ও বাতিলের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্যকারী।

৮. আল্লাহ তাঁর বিধানকে সহজ করেছেন; কঠিন করেন নাই।

৯. এ জন্যে যে, মানুষ যাতে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে।

১০. আমাদের রোযা পালন ও কুরআনের হিদায়াত গ্রহণ করা কর্তব্য।

৫

সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ

৩. সূরা-আলে-ইমরান

মদীনায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ২০০, রুকু-২০

আলোচ্য আয়াত ঃ ২৬-২৮

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

পরম করুণাময় আল্লাহ্র নামে শুরু করছি।

(٢٦) قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَاۤءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاۤءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاۤءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاۤءُ ط بِيَدِكَ الْخَيْرُ ط اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ (٢٧) تُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ ز وَتُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ ز وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاۤءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٢٨) لاَيَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكَافِرِيْنَ اَوْلِيَاۤءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ج وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِىْ شَىْءٍ اِلاَّ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقَاةً ط وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ ط وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ.

অনুবাদ ঃ (২৬) বলুন, ‘হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ! তুমি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান কর। আর যার নিকট থেকে ইচ্ছা রাজত্ব ছিনিয়ে নাও;

আর যাকে ইচ্ছা সম্মানিত কর এবং যাকে ইচ্ছা অপমানিত কর। আর তোমার হাতেই সকল কল্যাণ। নিশ্চয়ই তুমি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। (২৭) তুমি রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করাও এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করাও। আর তুমিই জীবিতকে বের করে আন মৃত হতে এবং মৃতকে বের করে আন জীবিত হতে। আর তুমি যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান কর। (২৮) মু'মিনগণ যেন মু'মিনগণ ব্যতীত কাফিরদেরকে বন্ধু, পৃষ্ঠপোষক ও সহযোগী রূপে গ্রহণ না করে। যে এরূপ করবে আল্লাহর সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। তবে হ্যাঁ, তোমরা তাদের জুলুম থেকে আত্মরক্ষার জন্য যদি বাহ্যত এ নীতি অবলম্বন কর তাহলে তা মাফ করে দেয়া হবে। কিন্তু মহান আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর সত্তা সম্পর্কে তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করছেন। আর তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরে যেতে হবে।

শাব্দিক অনুবাদ ঃ قُلْ ঃ আপনি বলুন। اللّٰهُمَّ ঃ হে আল্লাহ! مَالِكَ ঃ অধিপতি। الْمُلْكِ ঃ সাম্রাজ্যের। تُؤْتِي ঃ তুমি দান কর। الْمُلْكَ ঃ রাজত্ব। مَنْ تَشَاءُ ঃ যাকে ইচ্ছা। وَتَنْزِعُ ঃ আর ছিনিয়ে নাও। الْمُلْكَ ঃ রাজত্ব। مِمَّنْ تَشَاءُ ঃ যার থেকে ইচ্ছা। وَتُعِزُّ ঃ তুমি সম্মানিত কর। مَنْ تَشَاءُ ঃ যাকে ইচ্ছা। وَتُذِلُّ ঃ এবং অপমানিত কর। مَنْ تَشَاءُ ঃ যাকে ইচ্ছা। بِيَدِكَ الْخَيْرُ ঃ তোমার হাতে সকল কল্যাণ। إِنَّكَ ঃ নিশ্চয় তুমি। عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ঃ সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। تُوْلِجُ ঃ তুমি প্রবেশ করাও। الَّيْلَ ঃ রাতকে। فِي النَّهَارِ ঃ দিনের মধ্যে। النَّهَارَ ঃ দিনকে। فِي الَّيْلِ ঃ রাতের মধ্যে। وَتُخْرِجُ ঃ আর তুমি বের কর। الْحَيَّ ঃ জীবিতকে। مِنَ الْمَيِّتِ ঃ মৃত থেকে। الْمَيِّتَ ঃ মৃতকে। مِنَ الْحَيِّ ঃ জীবিত থেকে। وَتَرْزُقُ ঃ আর তুমি রিযিক দান কর। مَنْ تَشَاءُ ঃ যাকে চান। بِغَيْرِ ঃ ব্যতীত। حِسَابٍ ঃ হিসেবে। لَايَتَّخِذُ যেন গ্রহণ না করে। الْمُؤْمِنُوْنَ ঃ মু'মিনগণ। الْكَافِرِيْنَ ঃ কাফিরদেরকে। أَوْلِيَاءَ ঃ বন্ধু রূপে। مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ঃ মু'মিনগণ ব্যতীত। وَمَنْ يَّفْعَلْ ঃ আর যে ব্যক্তি

এরূপ করবে। فَلَيْسَ ঃ কাজেই তার জন্য থাকবে না। مِنَ اللهِ ঃ আল্লাহর পক্ষ থেকে। فِى شَىْءٍ ঃ কিছু। اِلاَّ اَنْ تَتَّقُوْا ঃ হ্যাঁ, যদি তোমরা কোন ক্ষতির আশংকা কর। مِنْهُمْ ঃ তাদের পক্ষ থেকে। تُقَةً ঃ কোন ভয়। وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ ঃ আর আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদেরকে সতর্ক করছেন। نَفْسَهُ ঃ নিজ সম্পর্কে। وَاِلَى اللهِ ঃ এবং আল্লাহর দিকেই। الْمَصِيْرُ ঃ ফিরে যেতে হবে।

আয়াতের শানে নুযুল

মুসলমানদের অব্যাহত উন্নতি ও ইসলামের ক্রমবর্দ্ধমান অগ্রগতি দেখে বদর যুদ্ধে পরাজিত এবং ওহুদ যুদ্ধে বিপর্যস্ত মুশরেক ও অন্যান্য অমুসলিম সম্প্রদায় দিশেহারা হয়ে পড়েছিল তাই মুশরেক, ইয়াহুদী ও খৃষ্টান সবাই মিলে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলমানদের অস্তিত্ব মুছে ফেলার জন্য মদীনা অবরোধ করে বসলো। পবিত্র কুরআনে এ যুদ্ধকে 'গাযওয়ায়ে আহযাব' বলা হয়েছে। রাসূল (স) সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ ক্রমে মদীনার বাইরে পরিখা খনন করার সিদ্ধান্ত নিলেন। প্রতি চল্লিশ হাত পরিখা খননের দায়িত্ব প্রতি দশজন মুজাহিদের ওপর অর্পন করেন। সাহাবীগণ রাসূলের পরিকল্পনা মাফিক ১০হাত গভীর ১০হাত প্রশস্ত ৬০০ হাত দীর্ঘ পরিখা খনন করেন। পরিখা খনন কালে একটি বিরাট প্রস্তরখন্ড বের হলো। সাবাহীগণ সর্বশক্তি ব্যয় করেও প্রস্তরখন্ডটি ভেঙ্গে অপসারণ করতে ব্যর্থ হলো। রাসূল (স) পাথরটিতে আঘাত করলে আলোক রশ্মি বের হয়েছিল, তা দেখে রাসূল (স) রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য বিজয়েরর সু-সংবাদ দান করেন। এতে মুনাফিকরা ও কাফিররা বিদ্রূপ করে বলতে থাকে যে, নিজের পা রাখার স্থান নেই, অথচ সঙ্গী-সাথীদের রোম ও পারস্য বিজয়ের সংবাদ দিচ্ছে। এ উক্তির অসারতা প্রমাণের জন্য এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। (তাফসীরে রুহুল মা'য়ানী)

হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) বলেন ঃ পরিখা খননের সময় একটি বিরাট পাথর অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালো। কোদাল নিয়ে আঘাত করলে কোদাল ফিরে আসছিলো। এ ব্যাপারটি রাসূল (স)-কে আমরা জানালাম। তিনি কোদাল হাতে নিয়ে 'বিসমিল্লাহ' বলে আঘাত করলেন। পাথরের একাংশ ভেঙ্গে গেল। তিনি বললেন ঃ 'আল্লাহু আকবার' আমাকে শাম দেশের চাবি দেয়া হয়েছে। আল্লাহর শপথ, আমি এখন সেখানের লাল মহল দেখতে পাচ্ছি। এরপর দ্বিতীয় বার আঘাত করলেন। আরো একটি টুকরো বের হলো। তিনি বললেন ঃ আল্লাহর শপথ, আমি এখন মাদায়েনের শ্বেত মহল দেখতে পাচ্ছি। অতপর তৃতীয় আঘাত করে বললেন ঃ 'বিসমিল্লাহ'। বাকি অংশ কেটে গেলো। এতে তিনি বললেন ঃ 'আল্লাহু আকবার', আমাকে ইয়েমেনের চাবী দেয়া হয়েছে। আমি এখন সানআর ফটক দেখতে পাচ্ছি। (আর রাহীকুল মাখতুম ঃ ৩১০)

হযরত ওমর (রা)-এর খিলাফতের সময় সমগ্র রোম ও পারস্য মুসলমানদের কর্তৃত্বাধীনে আসে। রাসূল (স) পাথরের ওপর আঘাতে টেলিভিশনের পর্দার ন্যায় যে দৃশ্য দেখেছিলেন তা বাস্তবায়ন হয়।

আয়াতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاۗءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاۗءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاۗءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاۗءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ؕ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

অনুবাদ

"বলুন, 'হে সার্বভৌম শক্তির মালিক আল্লাহ! তুমি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান কর। আর যার নিকট থেকে ইচ্ছা রাজত্ব ছিনিয়ে নাও; আর যাকে ইচ্ছা সম্মানিত কর এবং যাকে ইচ্ছা অপমানিত কর। আর তোমার হাতেই সকল কল্যাণ। নিশ্চয়ই তুমি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।"

আলোচ্য আয়াতে সার্বভৌম ক্ষমতার মূল উৎস যে মহান আল্লাহ তা'য়ালা এবং মান সম্মান, বিষয়-সম্পদ সব কিছুরই যে চাবী-কাঠি আল্লাহর কর্তৃত্বে তাই বলা হয়েছে। এতে সাবলীল ভাষায় একটি মুনাজাতের মাধ্যমে পৃথিবীর জাতিসমূহের উত্থান-পতন ও সাম্রাজ্যের পটপরিবর্তনে আল্লাহর অপ্রতিরোধ্য শক্তির কথা বলা হয়েছে। জগতের সমস্ত শক্তি ও রাষ্ট্রক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর করায়ত্ত। সম্মান ও অপমান তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনি একজন পথের ভিখারীকে রাজ সিংহাসনের মালিক করতে পারেন এবং প্রবল প্রতাপশালী সম্রাটদের হাত থেকে রাষ্ট্র ও সম্পদ ছিনিয়ে নিতে পারেন। তাই সার্বভৌম শক্তির মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালা।

সার্বভৌমত্বের মালিক একমাত্র আল্লাহ

নবীদের দাওয়াত ছিল আল্লাহ সমস্ত জগত ও সাম্রাজ্যের মালিক এবং তিনিই সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। তাই শাসন করার অধিকার একমাত্র তাঁরই। তাঁর রাজ্যে তাঁর সৃষ্টির ওপর আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো শাসন বা সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়া আল্লাহকে অস্বীকার করার শামিল।

لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ.

"তাঁর (আল্লাহর) সাম্রাজ্য সমগ্র আকাশ মন্ডল ও পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করে আছে।" (সূরা আল-বাকারা ঃ ২৫৫)

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ.

"আসমান ও যমীনের মালিক, বাদশা হচ্ছেন আল্লাহ এবং তাঁর শক্তিই সর্বজয়ী ও সর্বগ্রাসী।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৮৯)

تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ ز وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ.

"তিনি অতীব মহান ও শ্রেষ্ঠ সেই সত্বা যার মুঠির মধ্যে রয়েছে সকল কর্তৃত্ব-সার্বভৌমত্ব। প্রত্যেকটি বস্তুর ওপর তাঁর কর্তৃত্ব সংস্থাপিত।" (সূরা আল-মুলক ঃ ১)

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ.

"আল্লাহর রাজত্বের ব্যাপারে কোন শরীক নেই।" (সূরা-ইসরা ঃ ১১১)

সকল নবীগণই আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে একটি রাষ্ট্র গঠন করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন।

تُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ.

অনুবাদ

"তুমি রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করাও এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করাও।"

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

আল্লাহ তা'য়ালা কোন কোন ঋতুতে রাতের অংশকে দিনের মধ্যে প্রবিষ্ট করান। ফলে রাত ছোট ও দিন বড় হয়ে থাকে। যেমন গ্রীষ্মকাল । আবার কোন কোন ঋতুতে দিনের অংশকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান। ফলে দিন ছোট ও রাত বড় হয়। যেমন শীতকাল। দিন-রাত ছোট বা বড় হওয়া সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সাথে সম্পর্কযুক্ত। কাজেই আয়াতের সারমর্ম দাড়ায় এই যে, নভোমন্ডল, তৎসংশ্লিষ্ট সর্ববৃহৎ গ্রহ সূর্য এবং সর্বক্ষুদ্র উপগ্রহ চন্দ্র সবই আল্লাহ তা'য়ালার ক্ষমতাধীন। অপর আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

هُوَ الَّذِىْ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ.

"তিনি (আল্লাহ) জীবন দান করেন, আর তিনিই মৃত্যু দেন, রাত ও দিনের আবর্তন তাঁরই কর্তৃত্বাধীন।" (সূরা আল-মু'মিনুন ঃ ৮০)

وَتُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ.

অনুবাদ

"আর তুমিই জীবিতকে বের করে আন মৃত হতে এবং মৃতকে বের করে আন জীবিত হতে।"

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

জীবিত থেকে মৃত, মৃত থেকে জীবিত প্রাণী বের করার কয়েকটি ব্যাখ্যা রয়েছে । নিম্নে তা তুলে ধরা হল ঃ

১. জীবিতকে মৃত হতে। যেমন ড়িম থেকে বাচ্চা অথবা বীর্য থেকে মানব সন্তান অথবা বীজ থেকে বৃক্ষ বের করেন। আর মৃতকে জীবিত হতে যেমন-পশু-পাখী থেকে ডিম, মানব থেকে বীর্য অথবা বৃক্ষ থেকে ফল ও শুস্ক বীজ বের করেন।

২. ব্যাপক অর্থ নিলে, মৃত দ্বারা কাফির এবং জীবিত দ্বারা মু'মিন উদ্দেশ্য হবে। যেমন আযর হতে হযরত ইবরাহীম (আ)-কে বের করেছেন। আর হযরত নূহ (আ) থেকে কেন'য়ান (কাফির)-কে বের করেছেন।

৩. অথবা মন্দ হতে ভাল এবং ভাল হতে মন্দ বের করা উদ্দেশ্য।

৪. অথবা পূর্ণ হতে অপূর্ণ এবং অপূর্ণ হতে পূর্ণ বের করেন।

অথবা বিদ্বানের ঔরষে মূর্খ এবং মূর্খের ঔরষে বিদ্বান সৃষ্টি করেন।

অপর আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

إِنَّ اللّٰهَ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ، وَيحْىٖ وَيُمِيْتُ.

ইহা সত্য যে, আল্লাহর মুঠোর মধ্যে আসমান ও যমীনের রাজত্ব রয়েছে। তাঁরই অধীনে রয়েছে জীবন ও মৃত্যু। (সূরা আত-তাওবা ঃ১১৬)

وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

অনুবাদ

"আর তুমি যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান কর।"

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

আল্লাহ যাকে চান তাকে অপরিমিত জীবনোপকরণ প্রদান করেন। কোন সৃষ্টি জীবই তা জানতে পারে না এবং কেহ তা ঠেকাতেও পারে না। একথার কয়েকটি অর্থ হতে পারে ঃ

ক. তিনি আল্লাহ যাকে যতটুকু ইচ্ছা তাকে ততটুকু রিযক দিয়ে থাকেন; তাঁর নিকট থেকে হিসেব গ্রহণ করার কেউ নেই।

খ. তিনিই অসীম এবং অফুরন্ত রিযক বন্টন করেন। যাকে দেন তাকে খোলা মনে প্রশস্ত হৃদয়ে দিতে থাকেন। তাঁর অফুরন্ত ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে রাখেন।

গ. তিনি পাওয়ার অযোগ্যদেরকেও দান করেন। এটা তাঁর পক্ষ থেকে বিরাট করুণা। কেননা, পাওয়ার যোগ্যদেরকে দেয়া হয় তাদের কাজের বিনিময়ে যা হিসাবের ভিতরে। অযোগ্যদের দান করলে তা হয় হিসাবের বাইরে একান্ত অনুগ্রহে। আল্লাহ তা'য়ালার ঘোষণা হচ্ছে ঃ

اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ.

"আল্লাহ যাকে চান রিযকের প্রাচুর্য দান করেন, আর যাকে চান পরিমিত পরিমাণে রিযক দেন।" (সূরা আর-রা'দ ঃ ২৬)

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلاَّ عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا.

"যমীনে বিচরণশীল কোন জীব এমন নেই, যার রিযক দানের দায়িত্ব আল্লাহ গ্রহণ করেননি; আর এমন কোন বস্তু নেই, যার ঠিকানা বা অবস্থানের স্থান এবং কোথায় তাকে সোপর্দ করা হবে তিনি তা জানেন না।" (সূরা আল-হুদ ঃ ৬)

لاَيَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكَافِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ (ج) وَمَنْ يَّفْعَلْ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِىْ شَىْءٍ اِلاَّ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقَاةً (ط) وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ (ط) وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ.

অনুবাদ

"মু'মিনগণ যেন মু'মিনগণ ব্যতীত কাফিরদেরকে বন্ধু, পৃষ্ঠপোষক ও সহযোগী রূপে গ্রহণ না করে। যে এরূপ করবে আল্লাহর সাথে তার কোন

সম্পর্ক নেই। তবে হ্যাঁ, তোমরা তাদের জুলুম থেকে আত্মরক্ষার জন্য যদি বাহ্যত এ নীতি অবলম্বন কর তাহলে তা মাফ করে দেয়া হবে। কিন্তু মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁর সত্তা সম্পর্কে তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করছেন। আর তাঁরই দিকে তোমাদের ফিরে যেতে হবে।"

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ হাজ্জাজ ইবনে আমর (কা'ব ইবনে আশরাফের বন্ধু) এবং কায়েস ইবনে যায়েদ ইয়াহুদী ইসলাম হতে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য আনসারদের একটি দলের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব স্থাপন করে । তখন রিফাআ ইবনে মানযার, আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের, সাঈদ ইবনে খায়সাম (রা) আনসারদের ঐ দলটিকে সতর্ক করে বলেন ঃ ইয়াহুদীদের নিকট থেকে দূরে থাকবে, তাদের সাথে গোপনে কোন সম্পর্ক রাখবে না; হয়তঃ এরা তোমাদেরকে রাসূলের দীন থেকে ফিরিয়ে নিতে পারে। একথা আনসারগণ মানতে অস্বীকৃতি জানায়, তখন এ আয়াত অবতীর্ণ করে আল্লাহ তা'য়ালা মু'মিনদেরকে কঠোর ভাষায় অ-মুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা স্থাপন করতে নিষেধ করেন। আল্লাহ বলেন ঃ

وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ "তোমাদের মধ্যে যে তাদের অনুসরণ করবে অবশ্যই সে তাদের দলভুক্ত হবে।" (সূরা মায়েদা) মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর ইবাদত করা, আর মানুষের জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্ট অর্জন করা। জাগতিক কাজ-কারবার, রাজ্যশাসন, রাজনীতি ও পারস্পরিক সম্পর্ক সবই এ লক্ষ্যের অধীনে। অতএব, যে মানুষ এ লক্ষ্যের বিরোধী সে মানবতার প্রধান শত্রু। কাজেই এই শত্রুর সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব ও ভালবাসা কিছু সম্ভব নয়। বন্ধুত্ব ও শত্রুতা সবই আল্লাহর উদ্দেশ্যে হতে হবে। রাসূল (স) বলেন ঃ

مَنْ احَبَّ لِلّٰهِ وَابْغَضَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الاِيْمَانَ.

"যে আল্লাহর জন্য ভালবাসলো এবং আল্লাহর জন্যই শত্রুতা পোষণ করলো সে অবশ্যই তাঁর ঈমানকে পরিপূর্ণ করলো।" (আবু দাউদ)

اَفْضَلُ الاَعْمَال اَلْحُبُّ فِىْ اللّٰهِ وَالْبُغْضُ فِىْ اللّٰهِ.

"সর্বোত্তম আমল হচ্ছে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বন্ধুত্ব করা এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে শত্রুতা পোষণ করা।" (আবু দাউদ)

কাফিরদের সাথে মুসলমানদের আচার-ব্যবহারের শরয়ী বিধান

১. موالات (পারস্পরিক বন্ধুত্ব) ঃ কুফরীর প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে বন্ধুত্ব স্থাপন করা মুসলমানের পক্ষে কোন অবস্থায়ই জায়েয নয়। এ কাজ একেবারেই হারাম।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتَتَّخِذُوْا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى اَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءَ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ.

"হে মু'মিনগণ! তোমরা ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না; তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে অবশ্য তাদেরই একজন হবে। (সূরা মায়েদা ঃ ৫১)

২. مدارات (বাহ্যিক সদ্ব্যবহার) ঃ অ-মুসলিমদের সাথে বাহ্যিক সদ্ব্যবহার তিন অবস্থায় জায়েয। যথা-

ক. **ক্ষতিরোধের লক্ষ্যে** ঃ কাফিরদের কোন সদ্ব্যবহার না করলে যদি কোন ক্ষতি হবার আশংকা থাকে। তবে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা জায়েয। এ জন্যেই আল্লাহ বলেছেন ঃ اِلاَّ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقَاةً। তবে হ্যাঁ, তোমরা তাদের জুলুম থেকে আত্মরক্ষার জন্য যদি বাহ্যত এ নীতি অবলম্বন কর তাহলে তা মাফ করে দেয়া হবে।

খ. **দীনের কল্যাণার্থে** ঃ কাফিরদের সাথে সদ্ব্যবহার করলে তাদের যদি দীনের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তা হলে জায়েয।

গ. **মেহমানদারী রক্ষার্থে** ঃ যদি কোন অমুসলিম মুসলমানদের মেহমান হয়। তখন মেহমান হিসেবে তার সম্মান করা জায়েয।

৩. مواسات (সাহায্য করা) ঃ যুদ্ধরত কাফির ছাড়া সকল ধরনের

অমুসলিমদেরকে সৌহার্দ্যমূলক ব্যবহার ও সাহায্য করা জায়েয। রাসূল (স) ছিলেন 'রহমাতুল্লিল আলামীন' তিনি অ-মুসলিমদের সাথে যেরূপ অনুগ্রহ, সহানুভূতি ও সৌজন্যমূলক ব্যবহার করেছেন, তার নযীর খুঁজে পাওয়া দুস্কর। আমাদেরকেও সে নীতি অনুসরণ করা উচিত।

শিক্ষা

১.সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ্ তা'য়ালা।

২. সম্মান দেয়া ও নেয়ার মালিক আল্লাহ্ তা'য়ালা।

৩. আল্লাহর হাতেই সকল কল্যাণ নিহিত।

৪. জীবন-মৃত্যু আল্লাহর হাতে নিবদ্ধ।

৫. কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব করা যাবে না।

(৬)

আল্লাহ্ ভীতি ও জামায়াতে জিন্দেগীর গুরুত্ব ঃ

৩. সূরা-আলে-ইমরান

মদীনায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ২০০, রুকু-২০

আলোচ্য আয়াত ঃ ১০২-১০৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি।

(١٠٢) يٰاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَاتَمُوْتُنَّ اِلاَّ وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ (١٠٣) وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَاتَفَرَّقُوْا (ص) وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْكُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖ اِخْوَانًا (ج) وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَاحُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِنْهَا (ط) كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ (١٠٤) وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (ط) وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (١٠٥) وَلَاتَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَ هُمُ الْبَيِّنٰتُ (ط) وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ

عَذَابٌ عَظِيمٌ (١٠٦) يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ج فَأَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وَجُوْهُهُمْ قف أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ (١٠٧) وَأَمَّا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتْ وُجُوْهُهُمْ ط فَفِيْ رَحْمَةِ اللهِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ.

অনুবাদ ঃ (১০২) হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় করো। আর মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। (১০৩) তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে ঐক্যবদ্ধভাবে দৃঢ়তার সাথে ধারণ করো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমাদের প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত নি'য়ামতসমূহ স্মরণ কর, যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। অতঃপর তিনি তোমাদের অন্তরে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করে দিয়েছেন, ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গেলে। আর তোমরা এক অগ্নিকুন্ডের অতি সন্নিকটে অবস্থান করছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদিগকে তা হতে উদ্ধার করেছেন। এভাবে আল্লাহ তোমাদের সম্মুখে তাঁর নিদর্শনসমূহ স্পষ্ট করে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা সঠিক পথ প্রাপ্ত হতে পার। (১০৪) আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল হওয়া আবশ্যক, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, সৎকাজের আদেশ করবে এবং মন্দকাজ হতে বিরত রাখবে। বস্তুত তারাই হল সফলকাম। (১০৫) আর তোমরা তাদের ন্যায় হয়ো না, যারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ আসার পরও নিজেরা মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে, আর তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি। (১০৬) সে দিন কতক মুখমন্ডল উজ্জ্বল হবে, আর কোন কোন মুখমন্ডল হবে কালো। বস্তুতঃ যাদের মুখমন্ডল কালো হবে তাদেরকে বলা হবে, তোমরা কি ঈমান আনয়নের পর কুফরীর পথ অবলম্বন করেছ? অতএব তোমরা তোমাদের কুফরীর কারণে শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর। (১০৭) আর যাদের মুখমন্ডল উজ্জ্বল হবে, তারা আল্লাহর রহমতের মাঝে থাকবে, তাতে তারা চিরকাল অবস্থান করবে।

শাব্দিক অনুবাদ ঃ يَاأَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ঃ হে ঈমানদারগণ। اتَّقُوا ঃ তোমরা ভয় কর। اللهَ ঃ আল্লাহকে। حَقَّ ঃ প্রকৃত। تُقَاتِهٖ ঃ তাঁর ভয়ের । وَلَاتَمُوْتُنَّ ঃ আর তোমরা মৃত্যু বরণ করবে না। اِلَّا ঃ ব্যতীত। وَاَنْتُمْ ঃ আর তোমরা। مُسْلِمُوْنَ ঃ মুসলমান। وَاعْتَصِمُوْا ঃ আর তোমরা দৃঢ়ভাবে ধারণ কর। بِحَبْلِ اللهِ ঃ আল্লাহর রজ্জুকে। جَمِيْعًا ঃ ঐক্যবদ্ধভাবে। وَلَاتَفَرَّقُوْا ঃ এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যেয়ো না। وَاذْكُرُوْا ঃ আর তোমরা স্মরণ করো। نِعْمَتَ اللهِ ঃ আল্লাহর অনুগ্রহের কথা। عَلَيْكُمْ ঃ তোমাদের প্রতি। اِذْكُنْتُمْ ঃ যখন তোমরা ছিলে। اَعْدَاءً ঃ পরস্পর শত্রু। فَاَلَّفَ ঃ অতঃপর তিনি ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করে দিয়েছেন। بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ ঃ তোমাদের অন্তরে। فَاَصْبَحْتُمْ ঃ ফলে তোমরা হয়ে গিয়েছিলে। بِنِعْمَتِهٖ ঃ তাঁর অনুগ্রহে। اِخْوَانًا ঃ ভাই ভাই। عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ ঃ গর্তের একেবারে দ্বারপ্রান্তে। مِّنَ النَّارِ ঃ দোযখের। فَاَنْقَذَكُمْ ঃ অতঃপর তিনি তোমাদের উদ্ধার করেছেন। يُبَيِّنُ اللهُ ঃ আল্লাহ বর্ণনা করেন। اٰيٰتِهٖ ঃ তার নিদর্শনসমূহ। لَعَلَّكُمْ ঃ সম্ভবতঃ তোমরা। تَهْتَدُوْنَ ঃ সঠিক পথ প্রাপ্ত হবে। وَلْتَكُنْ ঃ আর অবশ্যই হওয়া উচিত। مِنْكُمْ ঃ তোমাদের মধ্য থেকে। اُمَّةٌ ঃ একটি দল। يَّدْعُوْنَ ঃ তারা আহ্বান করবে। اِلَى الْخَيْرِ ঃ কল্যাণের দিকে। وَيَاْمُرُوْنَ ঃ এবং তারা আদেশ করবে। بِالْمَعْرُوْفِ ঃ সৎকাজের। وَيَنْهَوْنَ ঃ এবং তারা নিষেধ করবে। عَنِ الْمُنْكَرِ ঃ মন্দ কাজ হতে। وَاُولٰئِكَ هُمُ ঃ আর তারাই। الْمُفْلِحُوْنَ ঃ সফলকাম। وَلَاتَكُوْنُوْا ঃ এবং তোমরা হয়ো না। كَالَّذِيْنَ ঃ তাদের মত। تَفَرَّقُوْا ঃ যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। وَاخْتَلَفُوْا ঃ এবং মতানৈক্য করেছে। مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَ هُمْ ঃ তাদের নিকট আসার পরও। الْبَيِّنٰتُ ঃ দলীল প্রমাণসমূহ। عَذَابٌ عَظِيْمٌ ঃ ভীষণ শাস্তি। يَوْمَ ঃ সে দিন। تَبْيَضُّ ঃ উজ্জ্বল হবে। وُجُوْهٌ ঃ চেহারা। وَّتَسْوَدُّ ঃ এবং কুৎসিত হবে। فَاَمَّا الَّذِيْنَ ঃ অতঃপর যারা। اَكَفَرْتُمْ؟ ঃ তোমরা কি কুফরী করেছ? بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ ঃ ঈমান আনয়নের পর।

فَذُوْقُوا ঃ সুতরাং স্বাদ গ্রহণ কর। الْعَذَابَ ঃ শাস্তির। بِمَا كُنْتُمْ ঃ কেননা তোমরা। تَكْفُرُوْنَ ঃ কুফরী করছো। وَاَمَّا الَّذِيْنَ ঃ আর যারা। اَبْيَضَّتْ ঃ উজ্জ্বল হবে। فِىْ رَحْمَةِ اللّٰهِ ঃ তারা থাকবে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে অর্থাৎ জান্নাতে। هُمْ فِيْهَا ঃ তারা সেখানে। خَالِدُوْنَ ঃ চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করবে।

সূরার নামকরণ ঃ সূরার ৩৩ নং আয়াত থেকে সূরার নামকরণ করা হয়েছে আলে-ইমরান ।

اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّاٰلَ اِبْرَاهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ.

আয়াতের শানে নুযূল ঃ মদীনার আওস ও খাজরাজ বংশ শৌর্যবীর্যে সকলের উর্ধ্বে ছিল। এ দু'টি বংশ প্রায়ই নিজেদের বংশ গরিমায় ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত থাকত। রাসূল (স) তাদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির ভাব সৃষ্টি করে দিলেন। এতে তাদের মধ্যকার দীর্ঘদিনের চলে আসা যুদ্ধের অবসান ঘটে এবং তারা মুসলমান হয়ে ভাই ভাই হিসেবে বসবাস করছিল। একদা তাদের দু'গোত্রের দু'জন আলোচনা প্রসঙ্গে পূর্ব শত্রুতার জের ধরে নিজেদের আভিজাত্য ও শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে বাদানুবাদ করতে থাকে। আওস গোত্রের এক ব্যক্তি বললেন ঃ আমাদের বংশে এমন চার ব্যক্তি রয়েছেন তাদের সমকক্ষ তোমাদের মধ্যে কেউ নেই। তারা হলেন-

খুযাইমা ইবনে সাবিত (রা), যার সাক্ষ্য দু'জনের সমান। হানযালা (রা), যাকে শাহাদাতের পর ফিরিশতাগণ গোসল দিয়েছেন। আসিম ইবনে সাবিত (রা), যিনি দীনের পুরোপুরি সাহায্য করেছেন। সা'দ ইবনে মায়ায (রা), যাঁর ওফাতে আল্লাহ্‌র আরশ কেঁপেছিল। প্রত্যুত্তরে খাজরাজ বংশের লোকটি বললেন ঃ আমাদের বংশেও চার ব্যক্তি রয়েছেন, যারা কুরআন মাজীদকে মজবুত ও সুদৃঢ় করেছেন। তাঁরা হলেন-

১. উবাই ইবনে কা'ব (রা)

২. ম্যা'য়ায ইবনে জাবাল (রা)

৩. যায়িদ ইবনে সাবিত (রা) ও

৪. আবু যায়েদ (রা)।

এছাড়া সা'দ ইবনে উবাদা (রা), যিনি আমাদের খতিব ও নেতা। এসব অহংকার ও আভিজাত্যপূর্ণ কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে উভয় বংশের লোকজন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছিল। এ সংবাদ পেয়ে রাসূল (স) তাদের মাঝে গমন করলে কুরআনের এ আয়াত নাযিল হয়। (তাফসীরে বায়যাভী)

বিষয়বস্তু ঃ আলোচ্য আয়াতে মুসলিম জাতির শক্তি সঞ্চয়ের তিনটি মূলনীতি তুলে ধরা হয়েছে।

১, তাকওয়া অর্জন;

২. জামায়াতে জিন্দেগী গঠন;

৩. সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎকাজে বাধা প্রদান।

يٰاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلاَتَمُوْتُنَّ اِلاَّ وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ.

অনুবাদ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করার মত ভয় কর। আর মুসলমান না হয়ে মুত্যুবরণ করো না।"

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

আল্লাহ তা'য়ালা এ আয়াতের মাধ্যমে ঈমানদারগণকে তাকওয়া অর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন। কাজেই আল্লাহকে ভয় করার হক আদায় করে ভয় করতে হবে যাতে করে ভয় করার নির্দেশ যথাযথভাবে পালন হয়। তাহলেই কেবল তাকওয়ার গুণাবলী অর্জিত হবে। আর যখন মৃত্যু আসবে তখন মুসলমান তথা আত্মসমর্পণকারী ব্যক্তি হিসেবে মৃত্যুবরণ করা সম্ভব হবে। "শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত অবিচলভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স)-এর পরিপূর্ণ আনুগত্য করে যাওয়া। একটি মুহূর্তের জন্যও যেন তাগুতের অনুকরণ না হয়। মৃত্যুর সময়ও যেন ইসলামের ওপর অটুট থাকতে পারে।" (তাফহীমুল কুরআন)

যথার্থভাবে কারো পক্ষেই আল্লাহকে ভয় করা সম্ভব নয়। তবে যতটুকু সম্ভব এবং যা করা আবশ্যক, তাই করা অত্র আয়াতের দাবী। (বাইয়ানুল কুরআন)

এ আয়াতে ঈমানদারগণকে যথার্থভাবে আল্লাহকে ভয় করতে আদেশ দেয়া হয়েছে। এ আয়াত অবতীর্ণ হলে সাহাবায়ে কিরাম (রা) ভীত হয়ে পড়েন যে, কিভাবে حَقَّ تُقَاتِهٖ এর এ কঠিন দায়িত্ব পালন করা সম্ভব? তখন আল্লাহ তা'য়ালা اِتَّقُوا اللّٰهَ مَااسْتَطَعْتُمْ এ আয়াত অবতীর্ণ করে বলেন ঃ তোমাদের সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর।

রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মুত্তাকী লোকদের পরিচয় তুলে ধরে বলেন ঃ

لَايَبْلُغُ الْعَبْدُ اَنْ يَّكُوْنَ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ حَتّٰى يَدَعَ مَالاَ بَأْسَ بِهٖ حَذْرًا لِّمَابِهٖ بَأْسَ-(ترمزى-ابن ماجه)

"কোন ব্যক্তি পাপ কাজে জড়িয়ে পড়ার ভয়ে (বাহ্যত) যে সব কাজে গুণাহ নেই (অথচ যাতে পাপ কাজে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে) তা পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত খোদাভীরু লোকদের শ্রেণীভুক্ত হতে পারবেনা।" (তিরমিযী ও ইবনে মাজা)

তাকওয়ার আভিধানিক অর্থ ঃ ১. ভয় করা; ২. বিরত থাকা; ৩. আল্লাহ ভীতি; ৪. বেছে চলা; ৫. আত্ম শুদ্ধি; ৬. রক্ষা করা; ৭. সতর্কতা অবলম্বন করা ইত্যাদি। (আল-ওয়াসীত)

শরীয়তের পরিভাষায়-১। পরকালীন জীবনে ক্ষতি কারক কাজ হতে পার্থিব জগতে বিরত থাকা। এ ধরনের গুণাবলী সম্পন্ন লোকদেরকে মুত্তাকী বলে।

২। একমাত্র আল্লাহর ভয়ে সকল প্রকার অন্যায় ও অসৎ কাজ থেকে নিজকে বিরত রেখে কুরআন সুন্নাহ মোতাবেক জীবন পরিচালনার নামই তাকওয়া।

মুত্তাকীদের পরিচয়

যারা অন্যায়, অত্যাচার ও যাবতীয় পাপকার্য হতে নিজেদের কলুষমুক্ত রাখার জন্য সদা জাগ্রত ও সতর্ক। সততা, আমানতদারী, ধৈর্য, শোকর, আদল প্রভৃতি সকল প্রকার অনুপম চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী। তারা শরয়ী আহকাম সর্ম্পকে সম্যক জ্ঞান রাখেন ও তদানুযায়ী আমল করেন তারা নিজেরা সৎকাজ করেন অন্যদেরকে সৎকাজের আদেশ দেন এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখেন। যে ব্যক্তির মধ্যে তাকওয়ার গুণাবলীর সমাহার ঘটে তাকে মুত্তাকী বলা হয়।

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা),থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি শিরক, কবীরাহ গুণাহ ও অশ্লীল বাক্য হতে নিজেকে বিরত রাখে তাকে মুত্তাকী বলা হয়।

মহান রব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে মুত্তাকীদের প্রাথমিক পরিচয় সম্পর্কে ঘোষণা–

اَلَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ–وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ.

১. যারা গায়েব বা অদৃশ্য বিষয়াবলীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে।

২. নামায প্রতিষ্ঠা করে।

৩. আল্লাহ প্রদত্ত জীবিকা ও ধনসম্পদ হতে তাঁরই নির্দেশিত পথে ব্যয় করে।

৪. মুহাম্মদ (স) এর প্রতি অবতীর্ন আলকুরআন এবং পূর্ববর্তী নবী রসূলদের প্রতি অবতীন আসমানী কিতাব সমূহে বিশ্বাস স্থাপন করে।

৫. পরকাল সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে।

সূরা বাকারার ১৭৭ নং আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা মুত্তাকীদের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো–

১. আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

২. পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

৩. ফেরেস্তাগণের উপর বিশ্বাস স্থ্বপন করা।

৪. আল্লাহর কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

৫. নবী ও রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

৬. আন্তরিকতার সাথে নিকটাত্মীয়কে সাহায্য করা।

৭. আন্তরিকতার সাথে ইয়াতিমকে সাহায্য করা।

৮. আন্তরিকতার সাথে মিসকিনকে (নিঃসম্বল) দান করা।

৯. আন্তরিকতার সাথে পথিককে সাহায্য করা।

১০.আন্তরিকতার সাথে সাহায্য প্রার্থীকে সাহায্য করা।

অপরাপর আয়াতেও এ ধরনের গুণাবলীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন–

১. প্রতিশ্রুতি পালন করা। (আলে ইমরান ঃ ৭৬)

২. পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

৩. নিন্দনীয় কাজ থেকে বিরত থাকে এবং পূণ্যের কাজে প্রতিযোগিতা করে। (আলে ইমরান ঃ ১১৪)

৪. ক্রোধ সংবরণ কারী ও মানুষের জন্য ক্ষমাশীল। (আলে-ইমরান)

৫. স্বচ্ছলতা ও অসচ্ছলতা উভয় অবস্থায় মানুষকে দান করা।

৬. চুক্তি রক্ষাকারী (আত-তওবা ঃ ৪)

৭.যারা পৃথিবীতে অহংকার করেনা এবং বিপর্যয় সৃষ্টি করেনা (কাসাস)

৮. যারা রাত্রে তাহাজ্জুদ পড়েন এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

৯. যারা বঞ্চিত ও প্রার্থীকে সম্পদ দান করতেন। (যারিয়া ঃ ১৯)

তাকওয়ার গুরুত্ব ও মর্যাদা

তাকওয়ার গুণ মানব চরিত্রের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। দুনিয়া ও আখেরাতের মূল ভিত্তি হচ্ছে তাকওয়া। আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিক্ষেত্রে তাক্ওয়ার প্রভাব ও গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ তা'য়ালা মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন ইবাদতের জন্য, আর তাকওয়া হচ্ছে সামগ্রিক ইবাদতের মূল। তাকওয়া বিহীন ইবাদত আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় নয়। আল্লাহর বাণী ঃ

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَادِمَائُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ.

"কুরবানীর পশুর রক্ত এবং মাংস আল্লাহর দরবারে পৌঁছেনা। বরং আল্লাহর দরবারে যা পৌঁছে তা হল তোমাদের (অন্তরের) তাকওয়া। (আলহাজ্জ ঃ ৩৭)

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ مَقَامٍ اَمِيْنٍ، فِىْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ.

মুত্তাকীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে উদ্যান ও ঝর্ণার মাঝে। (দুখানঃ ৫১-৫২)

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ جَنّٰتٍ وَّنَعِيْمٍ.

মুত্তাকীগণ থাকবেন জান্নাতের মধ্যে ভোগ বিলাসে। (আত-তুর ১৭)

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ.

সেদিন মুত্তাকীগণ থাকবেন প্রস্রবন বিশিষ্ট জান্নাতে। (আজ-জারিয়া ঃ ১৫)

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ جَنّٰتٍ وَّنَهَرٍ.

মুত্তাকীগণ থাকবেন স্রোতস্বিনী বিধৌত জান্নাতে। (আল-ক্বামার ঃ ৫৪)

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ.

নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়ালা মুত্তাকিদের ভালবাসেন। (আত-তওবা ঃ ৪)

وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ.

এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আর জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন। (আল-বাকারা ঃ ১৯৪)

তাকাওয়া মানব জীবনের এক মহৎগুণ যা পরকালে জাহান্নামের ভয়াবহ কঠিন শাস্তি থেকে মুক্তি দিবে। আল্লাহর বাণী ঃ

قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ، وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى وَلَاتُظْلَمُوْنَ.

হে রসূল (স) বলে দিন দুনিয়ার জীবন সম্পদ খুবই নগণ্য। আর পরকাল একজন খোদাভীরু ব্যক্তির জন্য অতিশয় উত্তম। আর তোমাদের প্রতি এক বিন্দু পরিমাণ যুলুম করা হবে না। অর্থাৎ জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে না। (সূরা আন-নিসা ঃ ৭৭)

দুনিয়ায় যারা তাকওয়ার অনুসারী এবং যারা প্রকাশ্যে ও গোপন সকল কাজে আল্লাহকে ভয় করে চলে পরকালে একমাত্র তারাই জান্নাত লাভ করবেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর বাণী ঃ "আর যে ব্যক্তি স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং নিজকে কুপ্রবৃত্তি হতে বিরত রাখে নিশ্চয়ই জান্নাত হবে তার আবাস স্থল।"

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِيْنَ هُمْ مُحْسِنُوْنَ.

আল্লাহতো তাদের সংগে রয়েছেন, যারা তাকওয়া সহকারে কাজ করে এবং ইহসান অনুসারে আমল করে। (সূরা আন-নাহল ঃ ১২৮)

সন্ত্রাস মুক্ত সমাজ ও সামাজিক শৃংখলা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাকওয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। মুত্তাকী বা আল্লাহভীরু লোকের অভাবে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে শৃংখলার অভাব দেখা দেয়। মানুষের মধ্যে অশান্তি বিরাজ করে। সমাজে ফেতনা-ফাসাদ, সন্ত্রাস, রাহাজানি, খুন-খারাবি ইত্যাদি অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। মানুষের জান মালে নিরাপত্তা থাকে না। এমনকি নারীরাও যালেমদের হাত থেকে রেহাই পায় না। একমাত্র তাকওয়া থাকলেই মানুষ নৈতিক চরিত্র অর্জন করে অসামাজিক কার্যকলাপ ত্যাগ করে প্রকৃত মানুষ হতে পারে। যখন সমাজের নেতৃত্ব মুত্তাকী লোকদের হাতে ন্যস্ত হবে এবং সমাজের মানুষ আল্লাহভীরু হবে তখনই সমাজ ও রাষ্ট্র সন্ত্রাস মুক্ত হবে।

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَاتَفَرَّقُوْا.

অনুবাদ

"তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে ঐক্যবদ্ধভাবে দৃঢ়তার সাথে ধারণ করো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।"

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

আল্লাহর দীনের ভিত্তিতে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। দীনের বিজয়ের স্বার্থে এর কোন বিকল্প নেই। আজ সারা দুনিয়ায় মুসলমানদের অনৈক্যের সুযোগে বাতিল শক্তি মুসলমানদেরকে পদদলিত করছে।

ক. আলোচ্য আয়াতে حَبْلُ শব্দ রয়েছে যার অর্থ রজ্জু, রশি, প্রতিশ্রুতি, চুক্তিপত্র ইত্যাদি حَبْلُ اللهِ এর দ্বারা আল্লাহর রজ্জু, আল্লাহর দীন, আল্লাহর কিতাব-কুরআন অর্থ গ্রহণ করা যায়। (তাফসীরে বাহারুল মূহীত)

খ. حَبْلُ اللهِ ঃ 'আল্লাহর রজ্জু' অর্থ-তাঁর দীন ইসলাম। তাকে রজ্জু এ জন্য বলা হয়েছে, এ সূত্র দ্বারাই এক দিকে আল্লাহর সাথে ঈমানদার লোকদের সম্পর্ক স্থাপন করা হয়, অপরদিকে ইহাই সমস্ত ঈমানদার লোকদের পরস্পর মিলিত করে একটি মজবুত জামায়াত সৃষ্টি করে। এ রজ্জুকে শক্ত হাতে ধরার অর্থ-মুসলমানদের দৃষ্টিতে দীন-ইসলামের মৌলিক গুরুত্ব থাকা বাঞ্ছনীয়, তাদের সকল আগ্রহ-উৎসহ ও কৌতুহল এ দীনের প্রতিই হওয়া উচিত। (তাফহীমুল কুরআন)

গ. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন ঃ রাসূল (স) বলেছেন ঃ

كِتَابُ اللهِ هُوَ حَبْلُ اللهِ الْمَمْدُوْدُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ.

কুরআন হচ্ছে আল্লাহ তা'য়ালার রজ্জু যা আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত প্রলম্বিত।

ঘ. যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) বলেন ঃ حَبْلُ اللهِ هُوَ الْقُرْآنُ আর্থাৎ আল্লাহর রজ্জু হচ্ছে কুরআন। (ইবনে কাসীর)

ঙ. حَبْلُ اللهِ ঃ দীনের রজ্জু। রজ্জু বলা কারণ হচ্ছে এই যে, দীনের ভিত্তিতেই বিশ্বাস স্থাপনকারীদের মধ্যে পরস্পর ঐক্যবদ্ধ করে মানুষকে

একদলে পরিণত করে এবং অন্য দিকে এর মাধ্যমে আল্লাহর সাথে দুনিয়াবাসী মানুষের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। (মা'য়ারিফুল কুরআন)

আল্লাহর কুরআনকে ঐক্যবদ্ধভাবে ধারণ করতে হবে পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকা যাবে না। এর অর্থ হচ্ছে সংগঠনভূক্ত থাকতে হবে।

জামায়াত শব্দের অর্থ

জামায়াত শব্দের অর্থ দল। আর দলবদ্ধভাবে আল্লাহর দীনের কাজ করতে হয়। ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করতে হলে ইসলামী সংগঠন গড়ে তোলা অপরিহার্য। সংগঠনই দাওয়াত সম্প্রসারণ ও জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে এবং ইসলাম বিরোধী শক্তির মোকাবেলা করতে কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়। এ জন্যই সংগঠনের অন্তর্ভূক্ত হয়ে ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ

وَمَنْ يَّعْتَصِمْ بِاللّٰهِ فَقَدْ هُدِىَ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে সে নিশ্চয়ই সত্য ও সঠিক পথে প্রদর্শিত হবে।" (আলে-ইমরান ঃ১০১)

সংগঠন সম্পর্কে কয়েক খানা হাদীস নিম্নে উল্লেখ করা হল

مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الاِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهٖ.

"যে ব্যক্তি জামায়াত ত্যাগ করে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল, সে যেন ইসলামের রজ্জু হতে তার গর্দানকে আলাদা করে নিল।" (আহমদ, আবু দাউদ)

لَايَحِلُّ لِثَلَاثَةٍ يَّكُوْنُوْا مِنَ الْاَرْضِ اِلاَّ اَمَّرُوْا عَلَيْهِمْ اَحَدُهُمْ.

"তিনজন লোক কোন নির্জন প্রান্তরে থাকলেও একজনকে আমীর না বানিয়ে থাকা জায়েয নয়।" (আবু-দাউদ)

وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ مُفَارِقٌ لِلْجَمَاعَةِ فَاِنَّهٗ يَمُوْتُ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً.

"যে ব্যক্তি জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে তার মৃত্যু হবে জাহিলিয়াতের মৃত্যু।" (মুসলিম)

قَالَ عُمَرُ (رض) لاَاِسْلاَمَ اِلاَّ بِجَمَاعَةٍ وَلاَجَمَاعَةَ اِلاَّ بِاِمَارَةٍ وَلاَ اِمَارَةَ اِلاَّ بِطَاعَةٍ .

অর্থ ঃ হযরত উমার (রা) বলেন ঃ দল ব্যতিত ইসলাম হয় না, নেতৃত্ব ব্যতিত সংগঠন হয় না, আবার আনুগত্য ছাড়া নেতৃত্ব হয় না।

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صلعم) قَالَ اِذَا كَانَ ثَلٰثَةٌ فِىْ سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا اَحَدَهُمْ. (ابوداؤد)

অর্থ ঃ আবু সাইদ খুদরী হতে বর্ণিত। নবী করিম (স) বলেছেন ঃ সফরে এক সঙ্গে তিনজন লোক থাকলে তারা যেন অবশ্যই একজনকে নেতা বানিয়ে নেয়। (আবু দাউদ)

عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صلعم) مَا مِنْ ثَلٰثَةٍ فِىْ قَرْيَةٍ وَلاَبَدْوٍ وَلاَتُقَامُ فِيْهِمِ الصَّلٰوةُ اِلاَّ قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَاِنَّمَا يَاْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ. (ابوداؤد)

অর্থ ঃ হযরত আবু দারদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ কোন জঙ্গল কিংবা জনপদে তিনজন লোকও যদি একত্রে বসবাস করে আর তারা যদি জামায়াতে নামায আদায় না করে, তবে শয়তান অবশ্যই তাদের উপর প্রভুত্ব ও আধিপত্য বিস্তার করবে। সুতরাং দলবদ্ধভাবে জীবন-যাপন করা তোমাদের কর্তব্য। কেননা, নেকড়ে বাঘ দল হতে বিচ্ছিন্ন পশুকে সহজে খেয়ে ফেলে। (আবু দাউদ)

عَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَلٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صلعم) اِنَّ الشَّيْطَانَ ذِئْبُ الْاِنْسَانِ كَذِئْبِ الْغَنَمِ يَاْخُذُ الشَّاةَ وَالْقَاصِيَةَ وَالنَّاحِيَةَ وَاِيَّاكُمْ وَالشِّعَابِ وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ. (مسند احمد)

অর্থ ঃ হযরত মু'য়ায ইবনে জাবাল (রা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ মানুষের বাঘ হচ্ছে শয়তান, যা ছাগল খেকো বাঘের মত, সে

ছাগলটি ধরে নিয়ে যায়, যে পাল থেকে বের হয়ে একাকী বিচরণ করে। কিংবা পাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা হয়ে যায়। সাবধান! তোমরা দল ছেড়ে বিচ্ছিন্ন হবে না এবং তোমরা অবশ্যই দলবদ্ধভাবে সাধারণের সাথে থাকবে। (মুসনাদে আহমদ)

مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَّكُنْ بُحْبُوْحَةِ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْاِثْنَيْنِ اَبْعَدُ.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি জান্নাতে আনন্দ উপভোগ করতে চায়, সে যেন ইসলামী দলকে আঁকড়ে ধরে। কেননা, শয়তান বিচ্ছিন্ন এক ব্যক্তির সাথে থাকে এবং সংঘবদ্ধ দু'ব্যক্তি থেকে অনেক দূরে থাকে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صلعم) يَقُوْلُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً. (مسلم)

অর্থ : হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত। আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি আমীরের (নেতার) আনুগত্যকে অস্বীকার করল : জামায়াত পরিত্যাগ করল এবং সে অবস্থায়ই মারা গেল সে জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল। (মুসলিম)

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صلعم) يَدُ اللّٰهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَمَنْ شَذَّ شُذَّ فِى النَّارِ. (ترمذى)

অর্থ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন : ইসলামী দলের প্রতি আল্লাহর রহমতের হাত বিস্তার করে রাখেন। যে সংগঠন থেকে দূরে সরে গেল, সে জাহান্নামের পথেই পতিত হল। (তিরমিযী)

وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْكُنْتُمْ اَعْدَاءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا.

অনুবাদ

"আর তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ প্রদত্ত নি'য়ামতসমূহ স্মরণ কর, যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। অতঃপর তিনি তোমাদের অন্তরে ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করে দিয়েছেন, ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পরে ভাই ভাই হয়ে গেলে।"

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

আল্লাহ্ তা'য়ালা এ আয়াতে মদীনার আউস ও খাজরাজ গোত্রদ্বয়কে তাদের পূর্বেকার যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। এ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে যে শত্রুতা সৃষ্টি হয়েছিল, তা তাদের বংশধরদের মধ্যে ১২০ বছর পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। অবশেষে আল্লাহ্ তা'য়ালা তাঁরই মনোনীত দীন ইসলামের বদৌলতে তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করে দেন এবং পূর্বেকার শত্রুতা চিরতরে দূর করেন।

وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا.

অনুবাদ

"আর তোমরা এক অগ্নিকুন্ডের অতি সন্নিকটে অবস্থান করছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদিগকে তা হতে উদ্ধার করেছেন।"

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

আলোচ্য আয়াতে اَلنَّارُ দ্বারা দু'টি অর্থ বুঝায়। যথা- যুদ্ধ ও জাহান্নাম।

ক. اَلنَّارُ ঃ অন্যায়ভাবে যুদ্ধ-বিগ্রহ। আরবের যুদ্ধবাজ গোত্রগুলো পরস্পর যুদ্ধে সমাজ ব্যবস্থাকে ধ্বংসের মুখোমুখি করলো। অগ্নিগর্ভে পড়লে মানুষ যেমন বাঁচতে পারে না, তেমনি যুদ্ধ ক্ষেত্রেও মানুষের একই অবস্থা হয়। তাই বলা হয়েছে ঃ "আর তোমরা এক অগ্নিকুন্ডের অতি সন্নিকটে অবস্থান করছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদিগকে তা হতে উদ্ধার করছেন।"

খ. اَلنَّارُ ঃ জাহান্নাম উদ্দেশ্য। আরবের জাহিলিয়াতের লোকেরা আল্লাহর

একত্ববাদ ভুলে গিয়ে শিরক-বিদয়াত ও অন্যায়-অত্যাচারে এমনভাবে জড়িয়ে পড়ে, যেন তাদের মৃত্যু হওয়া মাত্রই জাহান্নামে প্রবেশ করবে। সে অবস্থা থেকে আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে হিদায়াতের আলো দিয়ে রক্ষা করলেন।

فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا আল্লাহ তা'য়ালা রাসূল (স)-কে নবী হিসেবে প্রেরণ করে তাঁর ওপর কুরআন অবতীর্ণ করে মানবতার জন্য হেদায়েতের রাজ পথ রচনা করলেন। ফলে আরবের বর্বর জাতি ইসলামের সুশিতল ছায়া তলে আশ্রয় গ্রহণ করে জাহেলী সমাজের ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের হাত থেকে রক্ষা পেল এবং আল্লাহর পথের সৈনিক হয়ে বিশ্বে খ্যাতি লাভ করলো পরকালের জাহান্নামের আযাব থেকেও নিজেদেরকে রক্ষা করার পথ পেল।

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. (৮)

অনুবাদ

"আর তোমাদের মধ্যে এমন এটা দল হওয়া আবশ্যক, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে, সৎকাজের আদেশ করবে এবং মন্দকাজে হতে বিরত রাখবে। বস্তুত তারাই হল সফলকাম।"

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

ন্যায় কাজের আদেশ অন্যায় ও পাপ কাজের প্রতিরোধ করার তাকিদ প্রদান করা হয়েছে। ইসলামের সুমহান আদর্শের ভিত্তিতে কোন সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করতে হলে সেখানে সর্ব প্রথম মানুষের মন-মগজে ইসলামের সঠিক ধারণা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে ইসলামী আন্দোলনের সূচনা করতে হবে। আর এটা হলো মু'মিন জীবনের মিশন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন : "তোমরাই সর্বোত্তম দল, তোমাদেরকে মানুষের হেদায়াত ও সংস্কারের জন্য কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ দিবে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে মানুষকে বিরত

রাখবে।" এ দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হলে আল্লাহ তা'য়ালা আযাব নাযিল করে শাস্তি দেবেন। সে সময় যদি দো'য়া করা হয় সে দো'য়া আল্লাহর কাছে গ্রহণ যোগ্য হবেনা। তাতে আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে না।

ক. أُمَّةٌ ঃ অর্থ-দল। নবীর অনুসরীদেরকে أُمَّةٌ বলা হয়, যারা নবীর পাশে একটি উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুত থাকেন।

খ. أُمَّـةٌ ঃ অর্থ জামায়াত। ঐ জামায়াতকে أُمَّةٌ বলা হয়, যে জামায়াত কোন এক নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য মানুষের নেতৃত্ব দান করে।

যে সমাজে আল্লাহর দীন কায়েম নেই সে সমাজে আল্লাহর দীন কায়েমের আন্দোলনের দিকে ডাকাই হল সৎকাজ এবং সব ফরয়ের সেরা ফরয। দুনিয়ার সকল জাতির নেতৃত্ব দেয়ার জন্যই মুসলিম জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আজ মুসলিম জাতি তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হওয়ায় দুনিয়ার নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব হারিয়ে লাঞ্ছিত ও অপমানিত।

عَنْ حُذَيْفَةَ (رض) عَنِ النَّبِـىِّ (صلعم) قَـالَ وَالَّـذِىْ نَفْسِـىْ بِيَـدِهِ لَتَـأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللّٰهُ اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ وَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ. (ترمذى)

অর্থ ঃ হযরত হুযাইফা (রা) হতে বর্ণিত। নবী করিম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, যার নিয়ন্ত্রণে আমার জীবন। অবশ্যই তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দিবে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ হতে লোককে বিরত রাখবে। নতুবা তোমাদের ওপর শীঘ্রই আল্লাহ আযাব নাযিল করে শাস্তি দিবেন। অতঃপর তোমরা তা হতে নিস্কৃতি পাওয়ার জন্য দো'য়া করতে থাকবে কিন্তু তোমাদের দো'য়া কবুল হবে না (তিরমিযী)

عَنْ جَرِيْرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رض) قَالَ سَـمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰـهِ (صلعـم) يَقُـوْلُ مَامِنْ رَجُلٍ يَكُوْنُ قَوْمٍ يَعْمَلُ فِيْهِمْ بِالْمَعَـاصِىْ يَقْـدِرُوْنَ عَلٰـى اَنْ يُّغَـيِّرَ

عَلَيْهِ وَلاَ يُغَيِّرُوْنَ اِلاَّ اَصَابَهُمُ اللّٰهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ قَبْلَ اَنْ يَّمُوْتُوْا. (ابوداؤد)

অর্থ ঃ হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহকে একথা বলতে শুনেছি যে, যে জাতির মধ্যে কোন এক ব্যক্তি পাপ কাজ করার জন্য লিপ্ত হয়, আর সে জাতির লোকেরা শক্তি থাকা সত্ত্বেও সে পাপ কাজ হতে বিরত রাখেনা, আল্লাহ সে জাতির উপর মৃত্যুর পূর্বেই এক ভয়াবহ আযাব চাপিয়ে দেন।

عَنْ عَدِىٍّ بْنِ عَلِيٍّ الْكِنْدِىْ قَالَ حَدَّثَنَا مَوْلًى لَنَا اَنَّهٗ سَمِعَ جَدِّىْ يَقُـوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (صلعم) يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ لاَيُعَذِّبُ الْعَامَّـةِ بِعَمَلِ خَاصَّةٍ حَتّٰى يَرَوُ الْمُنْكَرَ بَيْنَ ظَهْرًا فِيْهِمْ وَهُمْ قَـادِرُوْنَ عَلٰـى اَنْ يُّنْكِـرُوْا فَـاِذَا فَعَلُوْا ذَالِكَ عَذَّبَ اللّٰهُ الْعَامَّةَ وَالْخَاصَّةَ. (شرح السنة)

অর্থ ঃ হযরত আদী ইবনে আলী আলকেন্দী হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমাদের এক মুক্ত কৃতদাস আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, সে আমার দাদাকে একথা বলতে শুনেছেন যে, আমি নবী করিম (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ কখনো বিশেষ লোকদের (পাপ) কাজের জন্য সাধারণ মানুষের উপর আযাব পাঠান না। কিন্তু যদি (সাধারণ লোক) তাদের সামনে প্রকাশ্যভাবে পাপ কাজ হতে দেখে, আর তা বন্ধ করার শক্তি থাকা সত্ত্বেও যদি বন্ধ না করে কিংবা প্রতিবাদ না করে, তাহলে তখনই আল্লাহ পাক সাধারণ লোক ও বিশেষ লোক সকলকে একই আযাবে নিপতিত করেন। (শরহে সুন্নাহ)

অন্যায় প্রতিরোধে সকলেরই কল্যাণ নিহিত

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صلعم) مَثَلُ الْمُدْهِنِ فِىْ حُدُوْدِ اللّٰهِ وَالْوَاقِعِ فِيْهَا مَثَلُ قَوْمٍ اسْتَهَمُوْا السَّفِيْنَةَ فَصَارَ بَعْضُهُمْ فِـىْ اَعْلاَهَا فَكَانَ الَّذِيْ فِىْ اَسْفَلِهَا يَمُرُّ بِالْمَاءِ عَلَى الَّذِيْنَ فِىْ اَعْلَاهَا فَتَـأَذَّوْا

بِهٖ فَاَخَذَ فَاْسًا فَجَعَلَ يَنْقُرُ اَسْفَلَ السَّفِيْنَةِ فَاَتَوْهُ فَقَالُوْا مَالَكَ تَاَذَّيْتُمْ بِىْ وَلَاُبُدَّلِىْ مِنَ الْمَاءِ فَاِنْ اَخَذُوْا عَلٰى يَدَيْهِ اَنْجَوْهُ وَنَجَوْا اَنْفُسَهُمْ وَاِنْ تَرَكُوْهُ اَهْلَكُوْا وَاَهْلَكُوْا اَنْفُسَهُمْ . (بخارى)

অর্থ ঃ হযরত নু'মান ইবনে বশির হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যে, আল্লাহর প্রতিষ্ঠিত আইন-সীমা সম্পর্কে উদারনীতি পোষণকারী এবং উহার লংঘনকারী লোকদের দৃষ্টান্ত হচ্ছে সে যাত্রী সাধারণের ন্যায়, যারা একটি নৌকায় সাওয়ার হওয়ার জন্য লটারী ধরেছে এবং তার ফলাফল অনুযায়ী কিছু লোক উহার উপরিভাগে আরোহণ করে, আর কিছু লোক আরোহণ করে উহার নীচের তলায়। নীচের দিকে যারা থাকে তারা পানি নিয়ে উপরিভাগে উপবিষ্ট লোকদের কাছ থেকে যাতায়াত করত। ইহাতে উপরিভাগের লোকদের বড়ই কষ্ট অনুভব করত। এ অবস্থা দেখে নীচের তলার এক ব্যক্তি কুঠার হাতে নিয়ে নৌকার তলায় ছিদ্র করতে উদ্যত হল। এ সময় উপরের তলার লোক তার নিকট আসল এবং জিজ্ঞেস করল তুমি ইহা কি করছ? সে উত্তর দিল ঃ তোমরা আমার যাতায়াতের দ্বারা কষ্ট অনুভব কর, অথচ পানি আমার না হলে চলে না। এ অবস্থায় উপরভাগের লোকেরা যদি তার হাত ধরে, তা হলে তারা তাকে বাঁচাতে পারল এবং নিজেরাও বাঁচতে পারল। আর যদি তাকে এরূপ অবস্থায়ই ছেড়ে দেয়া হয় তা হলে, সে নিজেও ধ্বংস হবে এবং অন্য লোকদেরকে ধ্বংস করে ছাড়বে। (বুখারী)

وَلَاتَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَ هُمُ الْبَيِّنَاتُ (ط) وَاُولٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ.

অনুবাদ

"আর তোমরা তাদের ন্যায় হয়ো না, যারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ আসার পরও নিজেরা মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে, আর তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।"

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

ক. كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا : এ আয়াতে যে সব উম্মতের দিকে ইশারা করা হয়েছে, যারা আল্লাহর রসূলগণের নিকট হতে সরাসরি দীনের সুস্পষ্ট ও সঠিক শিক্ষা লাভের সুযোগ পেয়েছে, কিন্তু কিছু সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর দীনের বুনিয়াদ পরিত্যাগ করে অবান্তর, অপ্রাসঙ্গিক ও খুটিনাটি বিষয়ের ভিত্তিতে আলাদা-আলাদা ধর্মীয় দল বানাতে শুরু করেছে। এমনকি অযথা ঝগড়ায় লিপ্ত হয়েছে। যদ্বরুন আসল কাজের প্রতি তাদের বিন্দুমাত্র লক্ষ্য ছিল না বরং চরিত্র গঠনের সকল মৌলিক দিকগুলোকে ভূ-লুন্ঠিত করতে দ্বিধা করেনি। (তাফহীমুল কুরআন)

খ. كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا : আল্লামা আলূসীর মতে- এর দ্বারা ইয়াহুদী-খ্রিষ্টান জাতি উদ্দেশ্য। যারা দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে পরস্পর বিছিন্ন হয়ে পড়েছিল।

গ. كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا : কারো মতে বিদ'য়াতীগণ উদ্দেশ্য।

ঘ. অনেকে মনে করেন, এর দ্বারা জাবরিয়া-কাদরিয়া, রাফিযী-খারিজী, শিয়া ইত্যাদি সম্প্রদায় উদ্দেশ্য।

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَّتَسْوَدُّ وُجُوْهٌ ج فَاَمَّا الَّذِيْنَ اسْوَدَّتْ وُجُوْهُهُمْ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ.

অনুবাদ

"যে দিন কতেক মুখমন্ডল উজ্জ্বল হবে, আর কোন কোন মুখ হবে কালো। বস্তুতঃ যাদের মুখমন্ডল কালো হবে তাদেরকে বলা হবে, তোমরা কি ঈমান আনয়নের পর কুফরী অবলম্বন করেছ? অতএব তোমরা তোমাদের কুফরীর কারণে শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর।"

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

এখানে মু'মিন ও কাফির ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। ক. মু'মিনগণ সে দিন চরম আনন্দ ও খুশিতে থাকবে; কাফিরগণ মহা দুশ্চিন্তায় অস্থির ও

পাগল পারা থাকবে। খ. মু'মিনদের চেহারা পরিস্কার ও উজ্জ্বল হবে; কাফিরদের চেহারা একেবারে কালো হয়ে যাবে।

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ঃ এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণের মতামত ঃ

ক. হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে ঃ সুন্নতের অনুসারীদের উজ্জ্বল চেহারা হবে, আর বিদ'আতীদের চেহারা হবে কুৎসিত।

খ. হযরত আতা (রা)-এর মতে ঃ মুহাজির ও আনসারগণের চেহারা উজ্জ্বল হবে আর বনূ কুরাইযা ও বনূ নাযীরের লোকদের চেহারা কুৎসিত হবে।

গ. হযরত ইকরামা (রা)-এর মতে ঃ আহলে কিতাবের যারা ঈমান আনেনি, তাদের চেহারা কুৎসিত হবে; যারা ঈমান এনেছে তাদের চেয়ারা উজ্জ্বল হবে।

ঘ. পৃথিবীতে যারা কুফরি করবে তাদের সকলের চেহারা কুৎসিত হবে; ঈমানদারগণের চেয়ারা উজ্জ্বল হবে।

ঙ. খারিজিদের চেহারা কালো হবে এবং তাদের হাতে নিহতদের চেহরা উজ্জ্বল হবে।

اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ ঃ ঈমান গ্রহণের পর কারা কুফরী করেছে? এ ব্যাপারে মুফাস্সিরদের বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ

ক. উবাই ইবনে কা'ব (রা) বলেন ঃ সকল মানুষ ঐ সময় ঈমান গ্রহণ করেছেন, যখন তাদেরকে আদম (আ)-এর পৃষ্ঠদেশ হতে বের করা হয়েছিল। অতএব, দুনিয়ায় এসে যারা কুফরী করেছে, তারাই ঈমানের পরে কুফরী করেছে বলে প্রমাণিত।

খ. আহলে কিতাবকে বলা হয়েছে, তারা নবী (স)-এর আগমনের পূর্বে তাঁর প্রতি ঈমান রাখতো যখন তিনি রাসূল হয়ে এলেন, তখন তারা কুফরী শুরু করে দিল।

গ. হযরত কাতাদাহ (রা)-এর মতে ঃ যারা ঈমান এনে মু'মিন হয়েছিল, তার পরে কুফরী করে মুরতাদ হয়েছিল।

ঘ. হযরত হাসান বসরী বলেন ঃ যারা ঈমান গ্রহণ করে মুনাফিকীর পথ বেছে নিয়েছিল।

ঙ. সাধারণ এ ঘোষণা সকলের জন্য প্রযোজ্য যারা ঈমান আনার পর আবার তা তাগ করবে। তারা আল্লাহর রহমতের মাঝে থাকবে, তাতে তারা চিরকাল অবস্থান করবে।

وَاَمَّاالَّذِيْنَ ابْيَضَّتْ وُجُوْهُهُمْ.فَفِيْ رَحْمَةِ اللّٰهِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ.

অনুবাদ

"আর যাদের মুখমন্ডল উজ্জ্বল হবে, তারা আল্লাহর রহমতের মাঝে থাকবে, তাতে তারা চিরকাল অবস্থান করবে।"

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

মানুষ যত ইবাদতই করুক না কেন আল্লাহ তা'য়ালা অনুগ্রহ ছাড়া কেহই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। কারণ, ইবাদত করা মানুষের পরাকাষ্ঠা নয়; বরং আল্লাহ প্রদত্ত সামর্থের বলেই মানুষ ইবাদত করে। সুতরাং ইবাদত করলেই জান্নাতে প্রবেশ অপরিহার্য হয়ে যায় না; বরং আল্লাহর অনুকম্পার মাধ্যমেই জান্নাতে প্রবেশ করা সম্ভব হবে। (তাফসীরে কবীর)

"দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমরা যাতে লিপ্ত ছিলে তজ্জন্য মহাশাস্তি তোমাদিগকে স্পর্শ করত।" (সূরা আন-নূর ঃ ১৪)

وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَاَنَّ اللّٰهَ رَئُوْفٌ رَّحِيْمٌ.

"তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেহই অব্যাহতি পাইতে না এবং আল্লাহ দয়াদ্র ও পরম দয়ালু। (সূরা নূর ঃ ২০)

'রহমত' হলো চিরস্থায়ী সওয়াব। আর আল্লাহর অনুগ্রহেই তারা জান্নাতে চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। (তাফসীরে কাশশাফ)

শিক্ষা

১. স্বার্বভৌম ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ।

২. আল্লাহকে ভয় করে তাকওয়ার গুণ অর্জন করতে হবে।

৩. জামায়াতে জেন্দেগী গঠন করতে হবে।

৪. সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করার জন্য ইসলামী আন্দোলকে শক্তিশালী করতে হবে।

৫. ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে এখতেলাফের মাধ্যমে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়া যাবে না।

মানবতার মুক্তির জন্য জিহাদ ফিসাবিলিল্লাহ

৪. সূরা আন-নিসা

মদীনায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ১৭৬, রুকু-২৪

আলোচ্য আয়াত ঃ ৭৫-৭৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি।

(٧٥) وَمَالَكُمْ لَاتُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا (ج) وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا (لا) وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا (٧٦) اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ (ج) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطَانِ (ج) اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيْفًا.

অনুবাদ ঃ (৭৫) তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহর পথে লড়াই করছো না সেইসব অসহায় দুর্বল পুরুষ-নারী ও শিশুদের পক্ষে যারা বলে, হে আমাদের রব! এই জনপদ থেকে আমাদের বের করে নিয়ে যাও, যার অধিবাসীরা জালেম এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের কোন বন্ধু, অভিভাবক বানিয়ে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে সাহায্যকারী পাঠাও।

(৭৬) যারা ঈমানদার তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে, আর যারা কাফির তারা লড়াই করে তাগুতের পথে। অতএব তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো। নিশ্চয়ই শয়তানের কৌশল নিতান্তই দুর্বল।

শাব্দিক অনুবাদ ঃ وَمَالَكُمْ ঃ এবং তোমাদের কি হলো যে, لَاتُقَاتِلُوْنَ ঃ তোমরা লড়াই করবে না। فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ঃ আল্লাহর পথে। وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ ঃ সেসব দুর্বল। مِنَ الرِّجَالِ ঃ পুরুষ। وَالنِّسَاءِ ঃ ও স্ত্রীলোক। وَالْوِلْدَانِ ঃ এবং শিশুদের জন্য। اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ ঃ যারা ফরিয়াদ করছে। رَبَّنَا ঃ হে আমাদের প্রতিপালক। اَخْرِجْنَا ঃ আমাদের বের করে নাও। مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ ঃ এ জনপদ হতে। اَلظَّالِمِ ঃ অত্যাচারী। اَهْلُهَا ঃ যার অধিবাসীগণ। وَاجْعَلْ لَّنَا ঃ এবং বানিয়ে দাও আমাদের জন্য। مِنْ لَّدُنْكَ ঃ তোমার পক্ষ থেকে। وَلِيًّا ঃ কোন বন্ধু। وَّاجْعَلْ ঃ এবং বানিয়ে দাও। لَّنَا ঃ আমাদের জন্য। نَصِيْرً ঃ সাহায্যকারী। اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ঃ যারা ঈমান গ্রহণ করেছে। يُقَاتِلُوْنَ ঃ তারা লড়াই করে। فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ঃ আল্লাহর পথে। اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْ ঃ আর যারা কাফির। يُقَاتِلُوْنَ ঃ তারা লড়াই করে। فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ ঃ তাগুতের পথে। فَقَاتِلُوْا ঃ অতএব তোমরা লড়াই করো। اَوْلِيَاءَ ঃ বন্ধুদের বিরুদ্ধে। اَلشَّيْطَانِ ঃ শয়তানের। اِنَّ كَيْدَ ঃ নিঃসন্দেহে ষড়যন্ত্র। كَانَ ضَعِيْفًا ঃ নিতান্তই দুর্বল।

আয়াতের শানে নুযূল ঃ মহানবী (স) মক্কায় দীর্ঘ ১৩টি বছরে আল-কুরআনের আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। এতে মক্কার কাফিরেরা বাঁধা দিতে থাকে। বিরোধিতা যখন এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, তখন আর সেখানে থাকা সম্ভব নয় তখন তিনি তাঁর সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে আল্লাহ্ পাকের নির্দেশে মক্কা ছেড়ে মদিনায় হিজরত করেন। রাসূল (স)-এর হিজরতের পরেও কতিপয় সাহাবী মক্কায় রয়ে গিয়েছিলন, যারা শারীরিক দুর্বলতা ও আর্থিক অভাবের কারণে হিজরত করতে পারেনি। যেমন-

১. ইবনে আব্বাস;

২. সালামা বিনতে হিশাম;

৩. অলীদ ইবনে অলীদ;

৪. আবু জান্দাল ইবনে সাহল প্রমূখ।

এ সকল সাহাবীদের ওপর কাফির ও মুশরিকগণ নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দেয় এবং হিজরত করতে বাঁধা দেয়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের ঈমান ত্যাগে বাধ্য করা। কিন্তু ঐ সকল সাহাবীদের ঈমানের বলিষ্ঠতার দরুন কাফিরদের অত্যাচার বিন্দু মাত্র দীনের পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। তারা কেবল তাদের রব আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করেছিলেন এবং ধৈর্যধারণ করে তাঁরই কাছে নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ফরিয়াদ করেছিলেন। আল্লাহ তা'য়ালা তাদের সে ফরিয়াদ কবুল করে জিহাদের আয়াত অবতীর্ণ করে নির্যাতিত মুসলমানদের মুক্ত করার নির্দেশ দিলেন। তাতে সকল মুনাফিক ও দুর্বলচিত্তের মু'মিনগণ অলসতা প্রকাশ করে এবং যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে অনীহা প্রকাশ করে। তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন কাফিরদের কবল হতে ঐ সকল দুর্বল মু'মিনদেরকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ ছাড়া তোমাদের কোন বিকল্প পথ নেই।

আয়াতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

وَمَالَكُمْ لاَتُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ.

অনুবাদ

"তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহর পথে লড়াই করছো না।"

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তোমাদের এমন কি অজুহাত থাকতে পারে যাতে করে তোমরা জিহাদ করবে না? অথচ এ জিহাদ হবে কেবল আল্লাহর নির্দেশ ও বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য। নির্যাতিত দুর্বল পুরুষ-নারী ও শিশুদের উদ্ধারের জন্য এর কোন বিকল্প নেই। কারণ নারী-পুরুষ এবং শিশুদের অবস্থা খুবই করুণ। যুদ্ধ করেই তাদেরকে উদ্ধার করতে হবে।

জিহাদ অর্থ ঃ আভিধানিক অর্থঃ জিহাদ (جِهَادٌ) শব্দটি—جُهْدٌ শব্দ থেকে

উৎগত। এর আভিধানিক অর্থ কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা, কঠোর পরিশ্রম, চূড়ান্ত সাধনা, সর্ব শক্তি নিয়োগ করা, সংগ্রাম করা ইত্যাদি।

শরীয়তের পরিভাষায়-আল্লাহর দীনকে বিজয়ী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে সর্ব প্রকার প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে জীবন-সম্পদ, বুদ্ধি-জ্ঞান, শক্তি-সামর্থ উৎসর্গ করে সর্বাত্মক ও চূড়ান্ত সংগ্রাম করার নামই জিহাদ।

ইমাম বালাজুরী বলেছেন ঃ জিহাদ অর্থ আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা। আর জিহাদ শব্দটি مُجَاهِدَة থেকে গৃহীত। যার অর্থ, দীন কায়েমের উদ্দেশ্যে (পরস্পর) যুদ্ধ করা। এটি হচ্ছে ছোট জিহাদ। আর জিহাদে আকবার বা বড় জিহাদ হচ্ছে নফসের সাথে জিহাদ করা।

জিহাদের প্রকার ভেদ ঃ জিহাদকে প্রথমত দু'শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

ক. যাহিরী বা প্রকাশ্য জিহাদ।

খ. বাতিনী বা অপ্রকাশ্য জিহাদ।

ক. যাহিরী বা প্রকাশ্য জিহাদ ঃ কাফির, মুশরিক, তাগুত তথা ইসলামের চরম শত্রু খোদাদ্রোহী নাস্তিক্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিরোধিতা ও প্রতিকূল পরিবেশের মোকাবিলা করে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজের জান-মাল উৎসর্গ করাই হলো যাহিরী জিহাদ বা প্রকাশ্য সংগ্রাম।

وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ.

"আল্লাহর পথে জিহাদ কর, যেমন জিহাদ করা উচিত।"(সূরা হজ্জ ঃ৭৮)

খ. বাতিনী বা অপ্রকাশ্য জিহাদ ঃ মানুষের চরম দুশমন শয়তান ও নফসে আম্মারা বা কু-প্রবৃত্তি। কু-প্রবৃত্তি তথা কাম-ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি মানুষকে সুপথ থেকে কুপথে পরিচালিত করে। মানুষকে এ অপ্রকাশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে সর্বদা লড়াই করতে হয় বলে একে বাতিনী জিহাদ বলে। ইসলামের পরিভাষায় এ জিহাদকে জিহাদে আকবার বলে।

اَلْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ لِنَفْسِهٖ.

"প্রকৃত মুজাহিদ ঐ ব্যক্তি যে নিজের নফসের সাথে জিহাদ করে।"

ক.যাহিরী বা প্রকাশ্য জিহাদকে আবার চারভাগে ভাগ করা হয়েছে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো। যথা- ক. ব্যক্তিগত কর্তব্য পালনে জিহাদ; খ. কায়িক জিহাদ; গ. আর্থিক জিহাদ; ঘ.বুদ্ধি বৃত্তিক জিহাদ।

"ঈমানদারগণ আল্লাহর পথে লড়াই করে। আর কাফিরেরা লড়াই করে তাগুতের পথে।" (সূরা আন-নিসা ঃ ৭৬)

জিহাদের গুরুত্ব ঃ ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখতে এবং সামাজিক সভ্যতাকে স্থির ও বিকারমুক্ত রাখতে তথা মুসলমানদের জীবন, সম্পদ, স্বাধীনতা রক্ষা, নিপীড়িত ও নির্যাতিত মানুষের মুক্তি এবং সর্বোপরি আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদের গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ তা'য়ালা জিহাদের নির্দেশ দিয়েছেন।

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَ هُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ.

"জিহাদ তোমাদের ওপর ফরয করা হয়েছে, যদিও তা তোমাদের জন্য কষ্টকর হোক না কেন।" (সূরা আল-বাকারা ঃ ২১৬)

مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَاءِ فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ.

"যে ব্যক্তি আল্লাহর বাণীকে উর্ধ্বে তুলে ধরার জন্য জিহাদে লিপ্ত হয় সে আল্লাহর পথেই আছে।" (বুখারী)

যারা আল্লাহর সীমালংঘন করে, হারামকে হালাল মনে করে ও দীনে হকের বিরোধিতা করে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হবে।

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لاَيُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلاَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُوْنَ مَاحَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلاَ يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ.

"তোমরা যুদ্ধ কর ঐ সব লোকদের বিরুদ্ধে, যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স) যা হারাম করেছেন, তা

হারাম মনে করে না এবং সত্য দীনকে (জীবন বিধান হিসেবে) গ্রহণ করে না।" (সূরা আত-তাওবা ঃ ২৯)

وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ.

অনুবাদ

"সেইসব দুর্বল পুরুষ-নারী ও শিশুদের পক্ষে।"

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ দ্বারা আমাকে এবং আমার আম্মাকে বুঝানো হয়েছে। অপর এক বর্ণনা মতে وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ দ্বারা ঐ সকল লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে, যাঁরা মুসলমান হয়েছেন; কিন্তু তখনও মক্কা হতে মদীনায় হিজরত করতে পারছিলেন না। এদের কারো কারো নাম তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, হযরত ইবনে আব্বাস ও তাঁর মাতা, সালামা ইবনে হিশাম, ওলীদ ইবনে সাহল প্রমুখ।। অথচ তারা মক্কার কাফিরদের দ্বারা নির্যাতিত হচ্ছিলেন। তাদের নির্যাতন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, অসহায় নারী-পুরষ এমনকি শিশু পর্যন্ত তাদের অকথ্য নিপীড়ন থেকে রক্ষা পায়নি। তারা কাফিরদের যাতাকল থেকে মুক্তি লাভের জন্য আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করছিলেন। আল্লাহ্ তাদের সে ফরিয়াদ কবুল করেন। মক্কা বিজয়ের ফলে তাঁরা সকলেই মুক্তি পান এবং শান্তি ও সম্মান লাভ করেন। এখানে مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ দ্বারা পুরুষ ও নারীর মধ্যে সন্তান-সন্ততিকে শামিল থাকা সত্ত্বেও আলাদাভাবে وَالْوِلْدَانِ ব্যবহার করা হয়েছে। এর কারণ হিসেবে মুফাসসিরগণ মনে করেন কাফিরদের নির্যাতনের মাত্রা এতই বেড়ে গিয়েছিল যে, তাদের অকথ্য নির্যাতনের হাত থেকে নিস্পাপ মাসুম ও নির্দোষ শিশুরা পর্যন্ত নিস্তার পায়নি।

اَلَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا، وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا (لا) وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا.

অনুবাদ

"তারা বলে, 'হে আমাদের রব! এই জনপদ থেকে আমাদের বের করে নিয়ে যাও, যার অধিবাসীরা জালেম এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের কোন বন্ধু, অভিভাবক বানিয়ে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে সাহায্যকারী পাঠাও।"

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

এ আয়াত দ্বারা মক্কা নগরী উদ্দেশ্য। দুর্বল ঈমানদার পুরুষ-নারী ও শিশুগণ আল্লাহ্‌র দরবারে মক্কার কাফিরদের নির্যাতন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ফরিয়াদ করেছিলেন। "হে আমাদের রব! আমাদেরকে এ জনপদ থেকে অর্থাৎ মক্কা নগরী হতে মুক্তি দাও, যার অধিবাসীগণ অত্যাচারী ও অতি নিষ্ঠুর।" এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, মু'মিনগণ আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'টি দু'আ করেছিলেন।

প্রথমত ঃ আমাদেরকে মক্কা নগরী থেকে স্থানান্তরের ব্যবস্থা কর;

দ্বিতীয়ত ঃ আমাদের জন্য সহায় বা সাহায্যকারী পাঠাও।

আল্লাহ তা'আলা তাদের দু'টি প্রার্থনাই কবুল করে নিয়েছিলেন। এভাবে যে, কিছু লোককে তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে যাবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন, যাতে তাদের প্রথম প্রার্থনাটি পূরণ হয়েছিল। অবশ্য কোন কোন লোক সেখানে রয়ে যান এবং মক্কা বিজয়ের পর রসূলে মকবুল (সা) ইতাব ইবনে উসায়দ (রা)-কে সে সব লোকের মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করেন। অতৎপর তিনি এসব উৎপীড়িতদেরকে অত্যাচারীদের উৎপীড়ন (অত্যাচার) থেকে মুক্ত করেন। আর এভাবেই পূর্ণ হয় তাদের দ্বিতীয় প্রার্থনাটি।

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ج وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطَانِ.

অনুবাদ

"যারা ঈমানদার তারা আল্লাহ্‌র পথে লড়াই করে, আর যারা কাফির তারা লড়াই করে তাগুতের পথে। অতএব তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো।"

আলোচ্য আয়াতে ঈমানদার ও কাফিরদের লড়াইয়ের পার্থক্য নির্ণয় করে মুসলমানদেরকে আল্লাহর পথে লড়াই করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। কাফিরেরা সব যুগেই তাগুতের পথে লড়াই করে, কেননা তারা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করে থাকে।

فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ ঃ তাগূতের পথে। طَاغُوْتِ - শব্দের অর্থ সীমালংঘণকারী, বিদ্রোহী, হঠকারী ইত্যাদি। কুরাইশদের একটি দেবতার নাম। এখানে طَاغُوْتِ দ্বারা খোদাদ্রোহী শক্তিকে বুঝানো হয়েছে। চরম অবাধ্য, সীমালংঘনকারী, সৎপথ পরিত্যাগ করে অসৎ পথে নেতৃত্বদানকারী।

পরিভাষায় 'তাগুত বলা হয় এমন শক্তিকে, যে নিজেই শুধু আল্লাহর আইন অমান্য করে না; বরং অন্যকেও অমান্য করতে বাধ্য করে।

পবিত্র কুরআনে সরাসরি তাগূত শব্দটি ৮বার এসেছে। আল্লাহর এ যমীনে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করা মু'মিনদের কাজ। কারণ আল্লাহই সমগ্র সৃষ্টির মালিক এবং তাঁর যাবতীয় বিধি-বিধান নির্ভেজাল ও ন্যায়ভিত্তিক। তাছাড়া কল্যাণভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলেই যথার্থ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তাই সত্যিকার মু'মিন ব্যক্তি এর থেকে বিরত থাকতে পারে না। আর কাফিররা খোদাদ্রোহীদের রাজত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তাগূতের পথে লড়াই করে। কারণ যারা কাফের তাদের বাসনা থাকে কুফরের প্রচলন, কুফরের বিজয় এবং পৈশাচিক শক্তির শাসন প্রতিষ্ঠা করা, যাতে করে বিশ্বময় কুফরী ও শেরকী বিস্তার লাভ করতে পারে। আর কুফরী ও শেরেকী যেহেতু শয়তানের পথ, সুতরাং কাফেরেরা শয়তানের পথেই সাহায্য করে থাকে। তাগূত সম্পর্কে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন ঃ

"দীনে কোন জোরজবরদস্তি নেই; সত্যপথ ভ্রান্তপথ থেকে সুস্পষ্ট হয়েছে। যে (طَاغُوْتِ) তাগূতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহতে বিশ্বাস করবে সে এমন এক দৃঢ় অবলম্বন ধরবে যা কখনও ভাঙবে না। আল্লাহ সর্বশ্রোতা,

প্রজ্ঞাময়। যারা ঈমান আনে আল্লাহ্ তাদের অভিভাবক, তিনি তাদের আঁধার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে যান। যারা কুফরী করে তাগুত তাদের অভিভাবক, তারা তাদের আলো থেকে আঁধারে নিয়ে যায়। তারাই জাহান্নামের বাসিন্দা। সেখানে তারা স্থায়ীভাবে বসবাস করবে।" (সূরা আল-বাকারা ঃ ১৫৬-১৫৭)

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتَ.

"আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল প্রেরণ করেছি আল্লাহর ইবাদত করার ও তাগূতকে বর্জন করার নির্দেশ দেবার জন্য।" (সূরা আন-নাহল ঃ ৩৬)

"আপনি তাদেরকে দেখেননি যারা দাবী করে যে, আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে তাতে তারা ঈমান রাখে, অথচ তারা তাগূতের কাছে বিচার প্রার্থী হতে চায়, যদিও তা প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদের আদেশ করা হয়েছে। বস্তুত শয়তান তাদের ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়।" (সূরা আস-নিসা ঃ ৬০)

اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيْفًا.

অনুবাদ

"নিশ্চয়ই শয়তানের কৌশল নিতান্তই দুর্বল।"

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখা যায় যে, শয়তান ও তার সাথীদের কর্ম কৌশল প্রস্তুতি খুবই বড়। প্রকৃত পক্ষে তাদের সকল কর্ম কৌশল খুবই দুর্বল। ঈমানদার ব্যক্তিদের তা দেখে ভীত হওয়া উচিত নয়। কারণ তাঁদের সাহায্যকারী হলেন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। কাজেই তাদের সকল কৌশল ও প্রস্তুতি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। শয়তানের কলাকৌশল কাফেরদের কিছু মঙ্গল সাধন করবে না। এ আয়াতে দু'টি শর্তের বিষয়ও প্রতীয়মান হয়।

১. যে লোকের বিরুদ্ধে শয়তান কলাকৌশল অবলম্বন করবে, তাকে প্রকৃত মুসলমান হতে হবে;

২. সে যে কাজে নিয়োজিত থাকবে, তা একান্তভাবেই আল্লাহ্‌র জন্য হতে হবে; কোন পার্থিব বস্তুর আকাঙ্খা কিংবা স্বীয়স্বার্থ প্রণোদিত হবে না।

প্রথম শর্ত اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا বাক্যের দ্বারা এবং এর দ্বিতীয় শর্ত يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ বাক্যের দ্বারা বোঝা যায়। এ দু'টি শর্তের যে কোন একটির অবর্তমানে শয়তানের কলাকৌশল দুর্বল হয়ে পড়া অবশ্যম্ভাবী নয়। হাঁ তবে দৃঢ় বিশ্বাসী ও কাজটি যদি নিছক আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই হয় তাহলে শয়তানের সকল কৌশলই ব্যর্থ হতে বাধ্য।

শিক্ষা

১. নির্যাতিত মানুষের পক্ষে জিহাদ করা ফরয।

২. যোগ্য নেতৃত্বের জন্য প্রার্থনা করা কর্তব্য।

৩. ঈমানদার ব্যক্তি যুদ্ধ করে আল্লাহ্‌র পথে।

৮

বাইয়াতের গুরুত্ব

৯. সূরা আত-তাওবা

মদীনায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ১২৯, রুকু-১৬

আলোচ্য আয়াত ঃ ১১১-১১২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি।

(١١١) اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ (ط) يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ (ط) وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ. وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهٖ (ط) وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ. اَلتَّائِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحَامِدُوْنَ السَّائِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ (ط) وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ.

অনুবাদ ঃ (১১১) নিশ্চয়ই আল্লাহ মু'মিনদের জান-মাল জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে শত্রুকে নিধন করে ও নিজে নিহত হয়। তাদের প্রতি তাওরাত, ইনজীল ও কুরআনে আল্লাহর

জিম্মায় একটি পাকাপোক্ত (জান্নাতের) ওয়াদা রয়েছে। আর আল্লাহর চেয়ে বেশী নিজের ওয়াদা পূরণকারী আর কে আছে? কাজেই তোমরা আল্লাহর সাথে যে কেনা-বেচা করেছো সে জন্য আনন্দ করো। এটিই সব চেয়ে বড় সাফল্য। (১১২) তারা তওবাকারী, ইবাদতকারী, প্রশংসাকারী, যমীনে বিচরণকারী, রুকুকারী, সিজদাকারী, সৎকাজের আদেশকারী, অসৎকাজ থেকে বিরতকারী এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা সংরক্ষণকারী। আর হে নবী! এ মু'মিনদেরকে তুমি শুভ সংবাদ দাও।

শাব্দিক অনুবাদ ঃ إِنَّ اللّٰهَ ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ। اشْتَرٰى ঃ ক্রয় করে নিয়েছেন। مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ঃ মু'মিনদের নিকট হতে। اَنْفُسَهُمْ ঃ তাদের জান। اَمْوَالَـهُمْ ঃ এবং তাদের মাল। بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ঃ তাদের জন্য যে জান্নাত রয়েছে এর বিনিময়ে। يُقَاتِلُوْنَ ঃ তারা সংগ্রাম করে। فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ঃ আল্লাহর পথে। فَيَقْتُلُوْنَ ঃ অতঃপর তারা মারে। وَيُقْتَلُوْنَ ঃ এবং মরে। وَعْدًا عَلَيْـهِ حَقًّا ঃ এ ব্যাপারে দৃঢ় ওয়াদা রয়েছে। فِى التَّوْرٰةِ ঃ তাওরাতে। وَالْاِنْجِيْـلِ ঃ এবং ইনজীলে। وَالْقُرْاٰنِ ঃ এবং কুরআনে। وَمَنْ اَوْفٰى ঃ আর কে আছে? অধিক পূরণকারী। بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ ঃ নিজ অঙ্গীকার পূরণে আল্লাহর তুলনায়। فَاسْتَبْشِرُوْا ঃ অতএব তোমরা আনন্দিত হও। بِبَيْعِكُمُ ঃ তোমাদের কেনা-বেচার ওপর। الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ঃ তোমরা তাঁর সাথে যে কেনা-বেচা করেছো। وَذٰلِكَ هُوَ ঃ আর এটাই হলো। الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ঃ মহাসাফল্য। التَّائِبُوْنَ ঃ তওবাকারী। الْعَابِدُوْنَ ঃ ইবাদতকারী। الْحَامِدُوْنَ ঃ প্রশংসাকারী। السَّائِحُوْنَ ঃ যমীনে বিচরণকারী। الرَّاكِعُوْنَ ঃ রুকুকারী। السَّاجِدُوْنَ ঃ সিজদাকারী। الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ ঃ সৎকাজের আদেশদানকারী। وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ঃ এবং মন্দ কাজ হতে নিবৃতকারী। وَالْحَافِظُوْنَ ঃ আর হেফাজতকারী। لِحُدُوْدِ اللّٰهِ ঃ আল্লাহর সীমাসমূহের। وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ঃ আর সুসংবাদ দাও মু'মিনদেরকে।

শানে নুযূল ঃ অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে এ আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে 'বাইয়াতে আকাবায়' অংশ গ্রহণকারী মু'মিনদের ব্যাপারে। তাই সূরাটি মাদানী হওয়া সত্ত্বেও এ আয়াতগুলোকে মাক্কী বলা হয়েছে।

'আকাবা' বলা হয় সংকীর্ণ গিরিপথকে। মক্কা থেকে মিনায় আসার পথে মিনার পশ্চিম পাশে একটি সংকীর্ণ পাহাড়ী পথ অতিক্রম করতে হয়। এই গিরিপথ আকাবা নামে বিখ্যাত। বর্তমানে হাজিদের সংখ্যাধিক্যের দরুন পর্বতের এ অংশটিকে শুধু জামরা বাদ দিয়ে মাঠের সমান করে দেয়া হয়েছে। এখানে মদীনা থেকে আগত আনসারগণের তিন দফায় 'বাইয়াত' নেয়া হয়। প্রথম দফা নেয়া হয় নবুয়তের একাদশ বর্ষে। তখন মোট ৬জন লোক বাইয়াত গ্রহণ করে মদীনায় ফিরে যায়। এতে মদীনার ঘরে ঘরে ইসলামে দাওয়াত পৌঁছে যায়। দ্বিতীয় দফা নেয়া হয় নবুয়তের দ্বাদশ বর্ষে। এ বছর হজ্জের সময় ১২জন লোক নবী করীম (স)-এর হাতে 'বাইয়াত' গ্রহণ করেন। তাঁরা নবী করীম (স)-কে আবেদন করেন যে, তাঁদেরকে কুরআনের তা'লীম দানের উদ্দেশ্যে সেখানে কাউকে প্রেরণ করা হোক। তিনি হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের (রা)-কে প্রেরণ করেন, যিনি সেখানকার মুসলমানদের কুরআন শিক্ষা দেন ও ইসলামের তা'লীম করেন। ফলে মদীনার বিরাট অংশ ইসলামের ছায়াতলে এসে যায়। অতঃপর নবুয়তের ত্রয়োদশ বর্ষে ৭০জন পুরুষ ও ২জন মহিলা সেখানে একত্রিত হন। এ হলো তৃতীয় ও সর্বশেষ বাইয়াতে আকাবা। সাধারণতঃ বাইয়াতে আকাবা বলতে একেই বুঝানো হয়। এই বাইয়াতটি ইসলামের মূল আকিদা ও আমল, বিশেষতঃ কাফিরদের সাথে জিহাদ এবং মহানবী (স) হিজরত করে মদীনায় গেলে তাঁর হিফাজত, সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য নেয়া হয়।

চুক্তির শর্ত

১. রাসূল (স) বললেন ঃ তোমরা সবাই আল্লাহর ইবাদত করবে; তাঁকে ছাড়া কারো ইবাদত করবে না।

২. তোমরা আমার হিফাজত করবে যেমন নিজের জান-মাল ও সন্তানদের হিফাজত করো।

সাহাবায়ে কেরামগণ আরজ করলেন ঃ এশর্ত দু'টো পূরণ করলে এর বিনিময়ে আমরা কি পাব? তিনি বললেন ঃ জান্নাত। তাঁরা পুলকিত হয়ে বললেন, আমরা এর জন্য রাজি, এমন রাজি যে নিজেদের পক্ষ থেকে এ চুক্তি রহিত করার আবেদন কোন দিনই পেশ করবোনা এবং রহিতকরণকে পছন্দ করবোনা। অতপর এ আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়।

সূরার নামকরণ ঃ এসূরাটি দু'নামে পরিচিত ও খ্যাত। এক নাম সূরা بَـرَاءَةُ (বারাআত) দ্বিতীয় নাম সূরা (تَوْبَةُ) তাওবাহ । بَرَاءَةٌ বলা হয় এজন্য যে, এতে কাফিরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ ও তাদের ব্যাপারে দায়িত্ব মুক্তির উল্লেখ রয়েছে। আর তাওবা বলা হয় এজন্য যে, এতে মুসলমানদের তওবা কবুল হওয়ার বর্ণনা রয়েছে। এ সূরা অবতীর্ণ হওয়ার পর চুক্তি ভঙ্গকারী সকল মুশরিকদের সাথে সন্ধি চুক্তি বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে এবং তাদের সাথে সর্ব প্রকার সম্পর্কচ্ছেদ করা হয়েছে। তাছাড়া সূরার শেষের দিকে কতিপয় মুসলমান নেতাদের তওবা কবুল করার সংবাদ দেয়া হয়েছে। একে উপলক্ষ করেই এ সূরার নাম "তাওবাহ" রাখা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল ঃ এ সূরাটি তিনটি ভাষণে সমাপ্ত হয়েছে। **প্রথম ভাষণ ঃ** সূরার শুরু থেকে পঞ্চম রুকুর শেষ পর্যন্ত। এ সকল আয়াত নাযিল হয় ৯ম হিজরীর যিলকদ মাস কিংবা তার কাছাকাছি সময়। এতে কাফির-মুশরিকদের প্রতি চরমপত্র তথা সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এ বছর হযরত আবু বকর (রা)-কে আমীরুল হজ্জ নিযুক্ত করে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করে দিয়েছিলেন। এমন সময় এভাষণটি অবতীর্ণ হয়। তিনি সংগে সংগেই হযরত আলী (রা)-কে তাঁর পিছনে পিছনে পাঠিয়ে দিলেন, যাতে করে হজ্জের সময় সারা আরবের প্রতিনিধিত্বশীল সমাবেশে তা শুনানো হয় এবং সে অনুযায়ী যে কর্মপদ্ধতি নির্দেশিত হয়েছিল তা ঘোষণা করা যায়। (তাফহীম)

দ্বিতীয় ভাষণ ঃ ষষ্ঠ রুকুর শুরু থেকে ৯ম রুকুর শেষ পর্যন্ত। এ সকল আয়াতসমূহ ৯ম হিজরীর রজব মাসে কিংবা তার কিছু পূর্বে অবতীর্ণ হয়।

এতে ঈমানদার লোকদেরকে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করা হয়। আর ঈমানের দুর্বলতার কারণে যে সকল লোক আল্লাহর পথে জান-মাল ব্যয় করতে প্রস্তুত ছিল না তাদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে।

তৃতীয় ভাষণ ঃ দশম রুকু থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত। এ সকল আয়াতসমূহ তাবুকের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে অবতীর্ণ হয়। এতে মুনাফিকদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়। তাবুক যুদ্ধে যারা পিছনে রয়ে গিয়েছিলেন তাদেরকে ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করা হয়। আর যে সাচ্চা ঈমানদার লোকেরা নিজেদের ঈমানের ব্যাপারে নিষ্ঠাবান ছিলেন ঠিকই কিন্তু আল্লাহর পথে জিহাদে অংশ গ্রহণ থেকে বিরত ছিলেন তাদেরকে তিরস্কার করার সাথে সাথে তাদের ক্ষমার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। (তাফহীম)

বিসমিল্লাহ্ না লেখার কারণ ঃ এ সূরার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ্' উল্লেখ না করার কারণ সম্পর্কে তাফসীরকারগণ বিভিন্ন মতামত উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম রাযী (র) একটি গুরুত্বপূর্ণ ও যুক্তি সংগত মতামত পেশ করেছেন। মূলতঃ এটাই সঠিক কথা। তিনি বলেন ঃ নবী করিম (স) নিজেই এ সূরায় 'বিসমিল্লাহ' লিখেননি, একারণে সাহাবায় কেরামও লিখেননি এবং পরবর্তী কালের লোকেরাও এরই অনুসরণ করেছেন। পবিত্র কুরআন যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে সেভাবেই হুবহু আছে। নবী করিম (স) থেকে অদ্যাবধি পূর্ণমাত্রায় সংরক্ষিত রাখার ব্যাপারে যে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে এটা তারই এক সুস্পষ্ট প্রমাণ।

অন্যান্য কারণ

১. সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কেহ কেহ এ আয়াত সমূহকে সূরা আনফালের অংশ বলে উল্লেখ করেছেন। একারণে 'বিসমিল্লাহ' লিখা হয়নি। যেমন অন্যান্য সূরার মধ্যখানে 'বিসমিল্লাহ' লিখা জায়েয নাই।

২. হযরত আলী (র)-এর মতে ঃ 'বিসমিল্লাহ হচ্ছে রহমত ও শান্তির পয়গাম, কিন্তু সূরা তওবায় কাফিরদের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার চুক্তিগুলো নাকচ করে দেয়া হয় বিধায় 'বিসমিল্লাহ' লিখা সঙ্গত নয়।

৩. কেউ কেউ মনে করেন এ আয়াত সমূহ অবতীর্ণ হওয়ার সময় হযরত জিবরাঈল (আ) 'বিসমিল্লাহ' শরীফ না নিয়ে আসার কারণেই তা লিখা হয়নি। যেভাবে অবতীর্ণ হয়েছে হুবহু অনুরূপভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

আয়াতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ঃ

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَـهُمُ الْجَنَّـةَ (৮) يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ (৮)

অনুবাদ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ মু'মিনদের জান-মাল জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে শত্রুকে নিধন করে ও নিজে নিহত হয়।"

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ জান্নাতের বিনিময়ে যে মুসলমানদের জান-মাল খরিদ করে নিয়েছেন, তার প্রতিশ্রুতি আদায়ের জন্য স্মরণ করিয়ে আল্লাহ ইরশাদ করেন যে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ মুসলমানদের জান-মালকে এ ওয়াদার বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন যে, তাদেরকে জান্নাত প্রদান করবেন। আল্লাহর কাছে জান-মাল বিক্রয়ের অর্থ এই যে, তারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে, তাতে কখনো শত্রুকে হত্যা করে এবং কখনো নিজে (শহীদ) নিহত হয়।

উপরোক্ত আয়াতে মুসলমানদের বলা হচ্ছে যে, ক্রয়-বিক্রয়ের এই সওদা তোমাদের জন্য লাভজনক ও বরকতময়। কেননা, এর দ্বারা অস্থায়ী জান-মালের বিনিময়ে চিরস্থায়ী জান্নাত পাওয়া গেল। চিন্তা করার ব্যাপার যে, এখানে ব্যয় হল শুধু মাল। কিন্তু আত্মা মৃত্যুর পরও বাকী থাকবে। চিন্তা করলে আরো দেখা যায় যে, মালা-মাল হলো আল্লাহর-ই দান। মানুষ শূন্য হাতেই জন্ম নেয়। অতঃপর আল্লাহ তাকে অর্থ-সম্পদের মালিক করেন এবং নিজের দেয়া সে অর্থের বিনিময়েই বান্দাকে জান্নাত দান করবেন। তাই হযরত ওমর (রা) বলেন ঃ 'এ এক অভিনব বেচা-কেনা, মাল ও মূল্য

উভয়ই তোমাদেরকে দান করলেন আল্লাহ।' হযরত হাসান বসরী (র) বলেন : ' লক্ষ্য কর, এ কেমন লাভজনক সওদা, যা আল্লাহ সকল মু'মিনের জন্য সুযোগ করে দিয়েছেন।' তিনি আরো বলেন : 'আল্লাহ তোমাদের যে সম্পদ দান করেছেন, তা থেকে কিছু ব্যয় করে জান্নাত ক্রয় করে নাও।' (মা'আরেফুল কুরআন)

বাইয়াত

বাইয়াত অর্থ : বাইয়াতুন (بَيْعَةٌ) আরবী শব্দ। যা بَيْعٌ শব্দ থেকে নির্গত। بَيْعَةٌ -শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ক্রয়-বিক্রয়, লেন-দেন, চুক্তি, আনুগত্যের শপথ, অঙ্গীকার; নেতৃত্ব মেনে নেয়া ইত্যাদি।

শরী'য়তের পরিভাষায়- আল্লাহ্ তা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে নিজের জান ও মালকে ইসলামী সংগঠনের দায়িত্বশীলের নিকট আনুগত্যের শপথের মাধ্যমে আল্লাহ্র পথে সপে দেয়ার ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতির নাম বাইয়াত।

বাইয়াতের গুরুত্ব

ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বাইয়াতের গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে নিজের জান ও মালকে ইসলামী সংগঠনের নেতা বা দায়িত্বশীলের নিকট আনুগত্যের শপথের মাধ্যমে আল্লাহর পথে সপে দেয়ার ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতির নাম বাইয়াত। জান-মালের প্রকৃত মালিক আল্লাহ। মু'মিনদের নিকট ইহা আমানত স্বরূপ। যখন এ জান ও মাল প্রকৃত মালিক ফেরত চাবেন তখন সন্তুষ্ট চিত্তে তা ফেরত দিতে বাধ্য থাকতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা নিজে এসে মু'মিনদের জান-মাল গ্রহণ করবেন না। তিনি তাঁর প্রতিনিধির মাধ্যমে তা গ্রহণ করেন। এ প্রতিনিধি হলেন যুগে যুগে নবী ও রাসূলগণ। আমাদের সর্বশেষ রাসূল হলেন প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (স)। এর পরে আর কোন নবী বা রাসূল আসবেন না। তিনিও আমাদের মাঝে বর্তমান নেই। তাই আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি তথা ইসলামী সংগঠনের নেতার মাধ্যমে বাইয়াত গ্রহণ করা ফরয। বাইয়াতের মাধ্যমে যে কথার স্বীকৃতি দেয়া হয় তা হলো :

১. জান-মাল আল্লাহর পথে ব্যয় করার অঙ্গীকার;

২. আল্লাহর বিধান পালন করার অঙ্গীকার;

৩. নেতার আনুগত্য করার অঙ্গীকার।

এতদ্ব্যতীত অন্য কোন পন্থায় মুক্তির আশা করা বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। বাইয়াত সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ ، يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ.

"হে রাসূল! যে সব লোক আপনার নিকট বাইয়াত গ্রহণ করে, তারা মূলতঃ আল্লাহর নিকটেই বাইয়াত গ্রহণ করে। তাদের হাতের ওপর আল্লাহর হাত রয়েছে।" (সূরা আল-ফাতাহ ঃ ১০)

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْيُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ.

"আল্লাহ ঐ মু'মিনদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, যারা গাছের নীচে আপনার নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেছিল।" (সূরা আল-ফাতাহ ঃ ১৮)

বাইয়াত গ্রহণের তাকিদ

عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ (رض) عَنِ النَّبِىِّ (صلعم) قَالَ مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِى عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً.(مسلم)

অর্থ ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূল (স) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বাইয়াতের বন্ধন ছাড়াই মৃত্যুবরণ করলো সে যেন জাহিলিয়াতের ওপর মৃত্যুবরণ করলো। (মুসলিম)

বাইয়াতের ওপর আমল করার তাকিদ

عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ ابْنِ عُمَرَ (رض) يَقُوْلُ كُنَّا اذَا بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (صلعم) عَلَى السَّمْعِ والطَّاعَةِ يَقُوْلُ لَنَا فِيْمَا اِسْتَطَعْتُمْ.(مسلم)

অর্থ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন রাসূল (স)-এর নিকট শ্রবন করা ও আনুগত্য করার ওপর বাইয়াত গ্রহণ

করতাম, তখন তিনি আমাদের বলতেন ঃ তোমাদের শক্তি-সামর্থ অনুযায়ী উক্ত বাইয়াতের ওপর আমল করা ফরয। (মুসলিম)

জিহাদের জন্য বাইয়াত গ্রহণ

قَالَ اَنَسُ بْنِ مَالِكٍ كَانَتِ الْاَنْصَارُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ تَقُوْلُ نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَاحُيِّيْنَا اَبَدًا. (بخارى)

অর্থ ঃ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আনসারগণ বলতো ঃ আমরা খন্দকের দিন নবী করিম (স)-এর নিকট জিহাদের জন্য বাইয়াত গ্রহণ করেছি; যতদিন আমরা বেচেঁ থাকবো ততদিনের জন্য। (বুখারী)

يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ ঃ এটিইসর্বপ্রথম জিহাদ সংক্রান্ত আয়াত, যা মক্কায় অবতীর্ণ হয়। এর পূর্বে মক্কায় অবস্থানকালে জিহাদের আর কোন আয়াত অবতীর্ণ হয়নি। তবে এর ওপর আমল শুরু হয় হিজরতের পরে। এরপর দ্বিতীয় আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ (সূরা হজ্জ ঃ ৩৯) বাইয়াতে আকাবার পরে মহানবী (সা) মক্কার মুসলমানদের মদীনায় হিজরত করার আদেশ দেন এবং তিনি নিজে হিজরতের জন্য আল্লাহর অনুমতির অপেক্ষায় থাকেন। (তাফসীরে মাযহারী)

জিহাদের গুরুত্ব

ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখতে এবং সামাজিক সভ্যতাকে স্থির ও বিকারমুক্ত রাখতে তথা মুসলমানদের জীবন, সম্পদ, স্বাধীনতা রক্ষা, নিপীড়িত ও নির্যাতিত মানুষের মুক্তি এবং সর্বোপরি আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদের গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে জিহাদের নির্দেশ দিয়েছেন।

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَ هُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ.

"জিহাদ তোমাদের ওপর ফরয করা হয়েছে, যদিও তা তোমাদের জন্য কষ্টকর হোক না কেন।" (আল-বাকারা ঃ ২১৬)

مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَاءِ فَهُوَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰه.

"যে ব্যক্তি আল্লাহর বাণীকে উর্ধ্বে তুলে ধরার জন্য জিহাদে লিপ্ত হয় সে আল্লাহর পথেই আছে।" (বুখারী)

اَلاَ تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا نَكَثُوْااِيْمَانَـهُمْ وَهَمُّـوْا بِـاِخْرَاجِ الرَّسُـوْلِ وَهُـمْ بَدَءُوْكُـمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ.

"কেন তোমরা যুদ্ধ করো না সে সব জাতির বিরুদ্ধে, যারা চুক্তি ভঙ্গ করেছে, রাসূলকে বহিস্কার করার উদ্যোগ নিয়েছে এবং নিজেরাই প্রথম আক্রমনের সূচনা করেছে।" (সূরা আত তাওবা ঃ ১৩)

আল্লাহর বিধান সংরক্ষণের জন্য জিহাদ করা অপরিহার্য। যারা আল্লাহর সীমালংঘণ করে, হারামকে হালাল মনে করে ও দীনে হকের বিরোধিতা করে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হবে।

قَاتِلُوْا الَّذِيْنَ لاَيُؤْمِنُونَ بِاللّٰه وَلاَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلا يُحَرِّمُوْنَ مَـاحَرَّمَ اللّٰـه وَرَسُوْلَهٗ وَلاَ يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ.

"তোমরা যুদ্ধ কর ঐ সব লোকদের বিরুদ্ধে, যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স) যা হারাম করেছেন, তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য দীনকে।" (সূরা আত-তওবা ঃ ২৯)

وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ.

অনুবাদ

"তাদের প্রতি তাওরাত, ইনজীল ও কুরআনে আল্লাহর জিম্মায় একটি পাকাপোক্ত (জান্নাতের) ওয়াদা রয়েছে।"

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

এ জিহাদ প্রসঙ্গে তাদের সাথে সত্য অঙ্গীকার করা হয়েছে। তাওরাতে, ইনজীলে এবং কুরআনেও। আর এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, আল্লাহই অধিক অঙ্গীকার পরিপূর্ণকারী।

وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهٖ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ. (৮)

অনুবাদ

"আর আল্লাহর চেয়ে বেশী নিজের ওয়াদা পূরণকারী আর কে আছে? কাজেই তোমরা আল্লাহর সাথে যে কেনা-বেচা করেছ সে জন্য আনন্দ করো। এটিই সব চেয়ে বড় সাফল্য।"

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

আর এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, আল্লাহই অধিক অঙ্গীকার পরিপূর্ণকারী। সুতরাং হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদের এ লেন-দেনের ওপর আনন্দ প্রকাশ কর। কেননা, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তোমরা অবশ্যই জান্নাত লাভ করবে। আর এ জান্নাত লাভই হলো মহাসাফল্য। আল্লাহর বাণী ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ، ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ.

"যারা ঈমান আনে এবং সৎ কাজ করে তাদের জন্য আছে জান্নাত, যার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত; ইহাই মহাসাফল্য। (সূরা বুরূজ ঃ ১১)

يَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ. وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ، ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

আর চিরস্থায়ী বসবাসের জায়গা জান্নাতের মধ্যে সর্বোত্তম বাসগৃহে। এটা মহাসাফল্য। আল্লাহ তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে এমন সব জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার নিচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। (সূরা আস-সফ ঃ ১২)

اَلتَّآئِبُوْنَ الْعٰبِدُوْنَ الْحٰمِدُوْنَ السّٰٓئِحُوْنَ الرّٰكِعُوْنَ السّٰجِدُوْنَ

الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ. (৮)

অনুবাদ

"তারা তওবাকারী, ইবাদতকারী, প্রশংসাকারী, যমীনে বিচরণকারী, রুকুকারী ও সিজদাকারী, সৎকাজের আদেশকারী এবং অসৎকাজ থেকে বিরতকারী এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা সংরক্ষণকারী। আর হে নবী! এ মু'মিনদেরকে তুমি শুভ সংবাদ দাও।"

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

উক্ত আয়াতে একজন পরিপূর্ণ মু'মিন মুজাহিদের যে নয়টি গুণ থাকার প্রয়োজন তার উল্লেখ করে আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন যে, আর সে মুজাহিদগণ তারা গুনাহ থেকে তাওবাকারী, আল্লাহর ইবাদতকারী, প্রশংসার বাণী উচচারণকারী, যমীনে বিচরণকারী, রুকু ও সিজদাকারী অর্থাৎ নামায কায়েমকারী, সৎকাজের আদেশদানকারী এবং খারাপ কাজ থেকে বাঁধাদানকারী ও আল্লাহর নির্ধারিত সীমা রক্ষাকারী। এর বিস্তারিত আলোচনা নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

১. আত-তায়েবুনা ঃ اَلتَّائِبُوْنَ ঃ আত-তায়েবুনা বহুবচন একবচনে اَلتَّائِبُ অর্থ ঃ তাওবাকারী, প্রত্যাবর্তনকারী, অনুতপ্ত । তাওবা শব্দের আভিধানিক অর্থ-অনুতপ্ত হওয়া, লজ্জিত হওয়া, ফিরে আসা। পারিভাষিক অর্থে তাওবা মানে আল্লাহর হুকুম অমান্যকারী ব্যক্তি অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে অপরাধের স্বীকৃতি প্রদান করে বিনয়ের সাথে ক্ষমা প্রার্থনা করা ও তাঁর দাসত্ব ও আনুগত্যের পথে ফিরে আসা। মু'মিন ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কেনা-বেচার যে চুক্তি করেছে অসচেতনভাবে সে অংগীকারের বিরুদ্ধাচরণ করলেই তীব্র অনুশোচনা সহকারে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে ক্ষমা চায় এবং নিজের অংগীকারকে পুনরায় তরতাজা করে নেয়।

২. আল-আবেদুনা ঃ اَلْعَابِدُوْنَ ঃ আল-আবেদুনা বহুবচন। একবচনে

اَلْعَابِدُ অর্থ ইবাদতকারী, উপাসক, পূজারী, সেবক, ধর্মপ্রাণ। আল্লাহ্ যা আদেশ করেছে তা করা এবং যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকাকে ইবাদত বলে।

৩. আল-হামিদুনা ঃ اَلْحَامِدُوْنَ আল-হামিদুনা বহুবচন একবচনে حَامِدٌ অর্থ প্রশংসাকারী, গুণগানকারী। যিনি আল্লাহ্র গুণাবলী ও অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁর প্রশংসা করেন।

৪. সায়েহুনা ঃ اَلسَّائِحُوْنَ সায়েহুনা অর্থ বিচরণকারী। কোন কোন মুফাসসির এর অর্থ করেছেন اَلصَّائِمُوْنَ অর্থাৎ রোযা পালনকারীগণ। মূলতঃ এখানে আল্লাহ্র দীন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জিহাদ করা; কুফর শাসিত এলাকা থেকে হিজরত করা; দীনের দাওয়াত দেয়া; মানুষের চরিত্র সংশোধন করা; পরিচ্ছন্ন ও কল্যাণকর জ্ঞান অর্জন করা; আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহ পর্যবেক্ষণ করা এবং হালাল জীবিকা অর্জন করার জন্য আল্লাহ্র যমীনে বিচরণ করা মু'মিনের গুণের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। (তাফহীম)

৫. রুকুকারী ঃ اَلرَّاكِعُوْنَ এরা আল্লাহ তা'য়ালার আনুগত্য তথা সকল হুকুম-আহকাম মেনে চলেন। যে সকল ইবাদতে রুকু করতে হয় সে সকল ইবাদতে রুকু করেন।

৬. সিজদাকারী ঃ اَلسَّاجِدُوْنَ আল্লাহ্র হুকমের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনকারী। যে সকল ইবাদতে সিজদাহ করতে হয় সে সকল ইবাদতে সিজদাহ করেন। তাছাড়া মু'মিনদের যে কোন বিজয় ও সাফল্যের জন্য আল্লাহ তা'য়ালার বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা স্মরণ করে তাঁরই নিকট সিজদায়ে অবনত হন।

৭. সৎকাজের আদেশ ঃ اَلْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ মু'মিনদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সে ন্যায় কাজের আদেশ দেবে।

৮. অসৎকাজের নিষেধ ঃ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ এবং অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করবে।

عَنْ حُذَيْفَةَ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ (صلعم) قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْ لَيُوْشَكَنَّ اللّٰهُ اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ وَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ. (ترمذى)

অর্থ ঃ হযরত হুযাইফা (রা) হতে বর্ণিত। নবী করিম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, যার নিয়ন্ত্রণে আমার জীবন। অবশ্যই তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দিবে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ হতে লোককে বিরত রাখবে। নতুবা তোমাদের ওপর শীঘ্রই আল্লাহ আযাব নাযিল করে শাস্তি দিবেন। অতঃপর তোমরা তা হতে নিস্কৃতি পাওয়ার জন্য দো'আ করতে থাকবে কিন্তু তোমাদের দো'আ কবুল হবে না (তিরমিযী)

আযাব চাঁপিয়ে দেয়া হয়

অর্থ ঃ হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহকে (স) একথা বলতে শুনেছি যে, যে জাতির মধ্যে কোন এক ব্যক্তি পাপ কাজ করার জন্য লিপ্ত হয়, আর সে জাতির লোকেরা শক্তি থাকা সত্ত্বেও সে পাপ কাজ হতে বিরত রাখেনা, আল্লাহ সে জাতির ওপর মৃত্যুর পূর্বেই এক ভয়াবহ আযাব চাপিয়ে দেন। (আবু দাউদ)

পাপের আযাব সকলকেই ভোগ করতে হয়

হযরত আদী ইবনে আলী আলকেন্দী হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমাদের এক মুক্ত কৃতদাস আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন, সে আমার দাদাকে একথা বলতে শুনেছেন যে, আমি নবী করিম (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ কখনো বিশেষ লোকদের (পাপ) কাজের জন্য সাধারণ মানুষের উপর আযাব পাঠান না। কিন্তু যদি (সাধারণ লোক) তাদের সামনে প্রকাশ্যভাবে পাপ কাজ হতে দেখে, আর তা বন্ধ করার শক্তি থাকা সত্ত্বেও যদি বন্ধ না করে কিংবা প্রতিবাদ না করে, তাহলে তখনই আল্লাহ পাক সাধারণ লোক ও বিশেষ লোক সকলকে একই আযাবে নিপতিত করেন। (শরহে সুন্নাহ)

৯. আল্লাহর সীমারেখা সংরক্ষণকারী ঃ وَالْحَافِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللهِ আল্লাহ তা'য়ালা ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে যে সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছেন সে সীমারেখা মেনে চলেন এবং তা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহতভাবে চালিয়ে যান। মু'মিনের অন্যতম গুণ হচ্ছে যে সে আল্লাহর সীমারেখা সংরক্ষণকারী হবেন এবং তা অটুট রাখার জন্য সর্ব শক্তি নিয়োগ করবেন।

শিক্ষা

১. মু'মিনদের জান-মাল জান্নাতের বিনিময়ে আল্লাহ ক্রয় করেছেন।

২. মু'মিনদের জান-মাল দিয়ে জিহাদ করা ফরয।

৩. প্রত্যেক মুসলমানের জন্য বাইয়াত গ্রহণ করা ফরয।

৪. প্রত্যেক মুসলমানের জন্য দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন করা কর্তব্য।

৫. আয়াতে উল্লেখিত মু'মিন জীবনের নয়টি গুণ অর্জন করা আবশ্যক।

(৯)

কবীরা গুনাহ

৫৩. সূরা আন-নাজ্‌ম

মক্কায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ৬২, রুকূ-৩

আলোচ্য আয়াত ঃ ৩১-৩২

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

(٣١) وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ (لا) لِيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اَسَاءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِىَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى

(٣٢) اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلاَّ اللَّمَمَ (ط) اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ (ط) هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فِىْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ (ج) فَلاَ تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ (ط) هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى.

অর্থ ঃ (৩১) আকাশমণ্ডলীতে যা কিছু আছে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহ্‌রই। যারা মন্দ কর্ম করে তাদেরকে তিনি দেন মন্দ ফল এবং যারা সৎকর্ম করে তাদেরকে দেন উত্তম পুরস্কার। (৩২) যারা গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকে; যদিও ছোটখাট অপরাধ হয়ে থাকে। তোমার প্রতিপালকের ক্ষমা অপরিসীম; আল্লাহ্ তোমাদের ব্যাপারে সম্যক অবগত। যখন তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলেন মাটি হতে এবং যখন

তোমরা মাতৃগর্ভে ভ্রূণরূপে ছিলে। অতএব তোমরা আত্ম পবিত্রতার দাবী করো না। প্রকৃত মুত্তাকী কে আল্লাহ্ তা ভাল করেই্ জানেন।

শব্দার্থ ঃ وَلِلّٰهِ ঃ এবং আল্লাহ্‌রই। مَا ঃ যা। فِى السَّمٰوٰتِ ঃ আকাশমন্ডলীতে وَمَا فِى الْاَرْضِ ঃ এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে। لِيَجْزِىَ ঃ প্রতিফল দান করেন। اَلَّذِيْنَ ঃ যারা। اَسَاۤءُوْا ঃ খারাপ করে। بِمَا عَمِلُوْا ঃ যা আমল করে। وَيَجْزِىَ ঃ এবং প্রতিদান পাবে। اَلَّذِيْنَ ঃ যারা। اَحْسَنُوْا ঃ ভাল করেছে। بِالْحُسْنٰى ঃ উত্তম প্রতিদানে ধন্য করবেন। اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ ঃ যারা বেঁচে থাকবে। كَبٰۤئِرَ الْاِثْمِ ঃ কবীরা গুনাহ থেকে। وَالْفَوَاحِشَ ঃ এবং অশ্লীল কাজ থেকে। اِلَّا ঃ ব্যতীত। اللَّمَمَ ঃ ছোট খাট অপরাধ। اِنَّ رَبَّكَ ঃ নিশ্চয়ই তোমার রব। وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ঃ ক্ষমা অপরিসীম। هُوَ ঃ তিনি। اَعْلَمُ ঃ অধিক জানেন। بِكُمْ ঃ তোমাদের সম্পর্কে। اِذْ اَنْشَاَكُمْ ঃ যখন তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। مِّنَ الْاَرْضِ ঃ যমীন থেকে। وَاِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ ঃ যখন তোমরা ছিলে ভ্রূণরূপে। فِىْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ ঃ তোমাদের মায়েদের গর্ভে। فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ ঃ অতএব তোমরা আত্মপবিত্রতার দাবী করো না। هُوَ ঃ তিনি। اَعْلَمُ ঃ অধিক জানেন। بِمَنِ ঃ কে, কোন ব্যক্তি। اتَّقٰى ঃ মুত্তাকী।

সূরার নামকরণ ঃ সূরার প্রথম শব্দ " وَالنَّجْمِ " -ই- এর নামরূপে গৃহীত হয়েছে। শুধুমাত্র 'আলামত' হিসেবেই " وَالنَّجْمِ " শব্দটিকে এই সূরার নামরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। বিষয় বস্তুর প্রেক্ষিতে ইহা সূরার শিরোনাম নহে। (তাফহীম)

নাযিলের সময়-কাল ঃ এ সূরা নাযিল সম্পর্কিত কয়েকটি হাদীস একত্রে পর্যালোচনা করলে নিঃসন্দেহে জানা যায় যে, সূরাটি নবুয়তের পঞ্চম বর্ষে অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এর বর্ণনায় জানা যায় কুরআনে পাকের এমন একটি সূরা অবতীর্ণ হয় যা রাসূল (স) কুরাইশদের সাধারণ সভায়, অপর বর্ণনায় হেরেম শরীফে সর্ব প্রথম পাঠ

করে শুনায়। রাসূল (স) যখন আয়াত সমূহ তিলাওয়াত করতে করতে সিজদার আয়াত পাঠ করে সিজদা করলেন তখন উপস্থিত কাফির ও ঈমানদার সকলেই তাঁর সাথে সাথে সিজদায় চলে গেল। ইসলামের চরম বিরোধী কাফির নেতারা সিজদা না করে পারে নাই। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন ঃ আমি কাফিরদের মধ্যে উমাইয়া ইবনে খালফকে দেখলাম, সে সিজদা না করে কিছুটা মাটি তুলে কপালে লাগিয়ে বলল, আমার জন্য ইহাই যথেষ্ট। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) আরো বলেন ঃ আল্লাহর শপথ পরে আমি তাকে কাফির অবস্থায় নিহত হতে দেখেছি। (বুখারী, মুসলিম)

নবুয়তের পঞ্চম বর্ষে কাফিরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে একদল ঈমানদার লোক আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। এ ঘটনার পর তারা জানতে পারে মক্কার লোক-জন সকলেই মুসলমান হয়ে গিয়েছে। হিজরতকারীদের কতিপয় মুসলমান বুক ভরা আশা নিয়ে মক্কায় চলে আসেন। কিন্তু তারা এসে দেখতে পেলেন, যুলুমের চাকা পূর্বানুরূপই চলছে। শেষ পর্যন্ত তারা পুনরায় আবিসিনিয়ায় চলে যান। যেহেতু এ ঘটনা নবুয়তের পঞ্চম বর্ষের তাই এ সূরা অবতীর্ণ হয়েছে ঐ বছরই।

ঐতিহাসিক পটভূমি ঃ মহানবী (স) নবুয়ত লাভের পর পাঁচ বছর পর্যন্ত গোপনে দাওয়াত দেন। এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কোন সাধারণ জন-সমাবেশে কুরআন মাজীদ পড়ে শুনাবার কোন সুযোগই তাঁর হয়নি। কাফেরদের কঠিন প্রতিরোধ-ই ছিল তাঁর পথের প্রতিবন্ধকতা। নবী করীম (স) এর ব্যক্তিত্বে, তাঁর তাবলীগী কার্যাবলী তৎপরতার কি তীব্র আর্কষণ ছিল এবং কুরআন মাজীদের আয়াতসমূহ কি সাংঘাতিক রকমের প্রভাব ছিল, সে বিষয়ে তারা সবিশেষ অবহিত ছিল। এ কারণেই তারা নিজেরাও এ কালাম না শুনবার এবং অন্যরাও যাতে শুনতে না পারে, সে জন্যে চেষ্টা ও যত্নের কোন ত্রুটি করতো না। নবী করীম (স) সম্পর্কে সমাজের মানুষের মধ্যে ভুল ধারণা সৃষ্টির লক্ষ্যে তাঁর বিরুদ্ধে নানা প্রকারের অপপ্রচার করে কেবলমাত্র নিজেদের মিথ্যা প্রচারণার বলে তাঁর এই দীনি

আন্দোলনের দাওয়াতকে অবরুদ্ধ ও দমন করে দিতে চেয়েছিল। এ উদ্দেশ্যে একদিকে তারা নানা স্থানে একথা রটিয়ে বেড়াচ্ছিল যে, মুহাম্মদ (স) বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছে এবং এক্ষণ সে অন্য লোকদের বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করতে চেষ্টা করছে। অপর দিকে তিনি যেখানে কুরআন শুনাবার জন্যে চেষ্টা করতেন সেখানে হট্টগোল, কোলাহল ও চিৎকার করা তাদের একটা স্থায়ী নিয়ম হয়ে দাড়িঁয়েছিল। তাঁকে কি কারণে পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত বলা হচ্ছে, লোকেরা যাতে জানতে-ই না পারে, এরূপ করার মূলে তাই ছিল তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

এরূপ অবস্থায় একদিন রাসূল (স) হারাম শরীফের মধ্যে ভাষণ দেবার জন্য আকস্মিক ভাবে দাঁড়িয়ে গেলেন। এখানে কুরাইশ বংশের লোকদের একটা বিরাট সমাবেশ হয়েছিল। এ সময় আল্লাহ তা'আলার তরফ হতে রাসূল (স) এর মুখে যে ভাষণটি বিঘোষিত হয়, তাই আমাদের সামনে রয়েছে 'সূরা আন নজম' রূপে। এ কালামের প্রভাব এত তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছিল যে, তিনি যখন এ সূরা শুনাতে শুরু করলেন, তখন তার বিপরীত চিৎকার ও কোলাহল করার কোন হুঁশ-ই বিরুদ্ধবাদীদের ছিল না। ভাষণ শেষে নবী কারীম (স) যখন সিজদায় পড়ে গেলেন, তখন তারাও সিজদায় পড়ে গেল, এ ছিল তাদের একটি বড় দুর্বলতা। এ দুর্বলতা যখন তারা দেখিয়ে ফেললো, তখন তারা বিশেষ ভাবে বিব্রত হয়ে পড়লো। সাধারণ লোকেরাও তাদেরকে ভর্ৎসনা করতে লাগলো এ বলে যে, 'যে কালাম শুনতে তারা অন্য লোকদেরকে নিষেধ করে বেড়াচ্ছে, তারা নিজেরাই সে কালাম শুধু যে মনোযোগ সহকারে শুনেছে তাই নয়, বরং হযরত মুহাম্মদ (সা) এর সাথে তারা সিজদাও করেছে।' লোকদের এ ভর্ৎসনা হতে বাঁচবার জন্যে (রাসূলের তিলাওয়াতকৃত আয়াতের অপব্যাখ্যা করে) তারা একটা মিথ্যা কথা বলতে শুরু করলো। তারা বলতে লাগলো, 'দেখুন আমরা তো শুনতে পাচ্ছিলাম যে, মুহাম্মদ (স) "اَفَرَاَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى وَالْمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرٰى" পড়ার পর যেন পড়ছেন ঃ تِلْكَ الْغَرَانِقَةُ.

الْعُلٰى وَاِنَّ شَفَعَتَهُنَّ لَتُرْتَجٰى (এরা সব উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন দেবী। তাদের শাফায়াতের আশা অবশ্যই করা যায়) এ জন্যে আমরা মনে করেছিলাম, মুহাম্মদ আমাদের আকীদা-বিশ্বাসের পথে ফিরে এসেছে। আর এ কারণে আমরা তাঁর সাথে একত্রিত হয়ে সিজদা করতে কোন দোষ মনে করিনি। অথচ এটা ছিল তাদের মনগড়া উদ্ভট কথা। (তাফহীম)

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য ঃ মক্কার কাফেররা কুরআন ও হযরত মুহাম্মদ (স) এর প্রতি যে আচরণ ও নীতি অবলম্বন করে চলছিল তাদের ঐ নীতি ও আচরণের ভ্রান্তি সম্পর্কে সাবধান করে দেয়াই এ সূরার মূল বিষয়বস্তু। সাথে সাথে একথাও বলে দেয়া হচ্ছে যে, রাসূল (স) তোমাদের সামনে যে মহান সত্যের দাওয়াত দিচ্ছেন তা কল্পনা প্রসূত কোন বিষয় নয়। ইহা হচ্ছে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত মহাসত্য। অতএব এ বিষয় নিয়ে বিতর্ক করা কোনভাবেই সঠিক নয়। এর পর পর তিনটি বিষয়ের কথা বলা হয়েছে ঃ

১. তোমরা যে ধর্মের অনুসরণ কর নিছক ধারণা-অনুমান ও মনগড়াভাবে ধরে নেয়া কতগুলো কথার ওপর-ই তার ভিত্তি সংস্থাপিত। তোমরা লাত-মানাত ও উয্যার ন্যায় কতিপয় দেবীকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছ, অথচ প্রকৃত ইলাহ হওয়ার ব্যাপারে এগুলোর একবিন্দু অংশ নেই। তোমরা ফেরেশতাগণকে মনে করে বসেছ খোদার কন্যা-সন্তান। অথচ তোমরা নিজেরা কন্যা-সন্তানকে নিজেদের জন্য লজ্জাকর মনে কর। তোমরা নিজেরা ধরে নিয়েছ যে, তোমাদের এসব মাবুদ আল্লাহ তা'আলা দ্বারা তোমাদের কাজ উদ্ধার করে দিতে পারে। অথচ আসল ব্যাপার এই যে, তারা-তো দূরের কথা, স্বয়ং খোদার নিকটবর্তী ফেরেশতাগণও একত্রিত হয়ে আল্লাহ দ্বারা কোন কথা মানিয়ে নিতে পারে না। তোমরা এ ধরনের যেসব আকীদা-বিশ্বাস গ্রহণ করে নিয়েছ, তার মধ্যে কোন একটাও কোনরূপ নির্ভুল জ্ঞান কিংবা কোন প্রমাণের ওপর ভিত্তিশীল নয়। বরং এর পশ্চাতে রয়েছে কিছু কামনা-বাসনা, যার কারণে তোমরা কতিপয় ভিত্তিহীন ধারণাকে প্রকৃত সত্য মনে করে নিয়েছ। তোমরা এরূপ একটা অতি বড় ও মৌলিক ভুলের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে রয়েছ।

২. লোকদেরকে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলাই সমগ্র বিশ্বলোকের একচ্ছত্র মালিক ও নিরংকুশ অধিকর্তা। যে লোক তাঁর দেখানো পথে অনুসারী সেই সত্যানুসারী। যে লোক তাঁর প্রদর্শিত পথের পথিক নয় সেই পথভ্রষ্ট। পথভ্রষ্টের ভ্রষ্টতা ও সত্যানুসারীর সত্যানুসরণ তার কিছু মাত্র অজানা নয়, নয় অগোচরীভূত। প্রত্যেকের আমল সম্পর্কে তিনি পুরোপুরি অবহিত। আর তাঁর নিকট অন্যায়ের প্রতিফল খারাপ এবং ন্যায় ও সত্যের প্রতিফল ভাল ও উত্তম হওয়া একান্তই অবশ্যাম্ভবী। তোমরা তোমাদের মনগড়া ধারণার ভিত্তিতে নিজেদেরকে কি মনে কর, আর নিজেদের পবিত্র হওয়ার কথা নিজেদের মুখে যতই প্রচার কর এবং নিজেদের সম্পর্কে যত বড় বড় দাবী করে বেড়াও না কেন, চূড়ান্ত ফয়সালা তার ভিত্তিতে কখনই হবে না। বরং চূড়ান্ত ফয়সালা হবে একথার ভিত্তিতে যে, আল্লাহ তোমাদেরকে মুত্তাকী বলে জানেন কিংবা গোমড়া বলে। তোমরা যদি বড় বড় গুনাহের কাজ পরিহার করে চল তাহলে আল্লাহর রহমত এতই ব্যাপক যে তিনি ক্ষুদ্র অপরাধ নিজ হতেই মাফ করে দেবেন।

৩. কুরআন মজীদ নাযিল হওয়ার শত শত বছর পূর্বে হযরত ইব্রাহীম ও হযরত মুসা (আ) এর সহিফা সমূহে সত্য দীনের যে কয়টি মৌলিক বিষয় বিবৃত হয়েছে, তাই এ সূরার মাধ্যমে লোকদের সম্মুখে পেশ করা হয়েছে। মুহাম্মদ (সা) কোন অভিনব ও অপূর্ব দীন নিয়ে এসেছেন এরূপ কোন ভুল ধারণায় লোকেরা নিমজ্জিত হয়ে না পরে, বরং তারা যেন জানতে পারে যে, এগুলো হল মৌলিক মহাসত্য এবং এ শাশ্বত ও চিরন্তন। খোদার নবী ও রসূলগণ চিরকালই এ মহাসত্য লোকদের সম্মুখে পেশ করে এসেছেন। সে সব সহিফা হতে একথাও এতে উদ্ধৃত হয়েছে যে, 'আদ, সামূদ, নূহের জাতি ও লূতের জাতির ধ্বংস কোন তাৎক্ষণিক ও আকস্মিকভাবে সংঘটিত ঘটনাবলীর পরিণতি নয়। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যে যুলুম ও খোদাদ্রোহীতার অনিবার্য প্রতিফল হিসেবেই ধ্বংস করেছিলেন যা হতে আজকের মক্কার কাফেররা বিরত থাকার জন্য কিছুতেই প্রস্তুত হচ্ছে না। একথা ও বিষয় সমূহের উল্লেখের পর ভাষণের সমাপ্তি করা হয়েছে এ কথা

দিয়ে যে, চূড়ান্ত ফয়সালার জন্য নির্দিষ্ট সময় সমপস্থিত প্রায়। তাকে কেউই প্রতিরুদ্ধ করতে পারে না। সেই নির্দিষ্ট মুহূর্তটি উপস্থিতির পূর্বেই মুহাম্মদ (স) ও কুরআনের মাধ্যমে তোমাদেরকে ঠিক সেভাবেই সতর্ক ও সাবধান করে দেয়া হয়েছে যেমন করে পূর্ববর্তী লোকদেরকে সাবধান করা হয়েছিল। এখন তোমরা কি এ ব্যাপারটিকেই অভিনব ও বিরল বলে মনে করছ? এজন্যই কি তোমরা একে ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করছ? আর কথা শুনার জন্য প্রস্তুত হচ্ছ না? আওয়াজ আসলেই তোমরা হট্টগোল ও কোলাহল করতে শুরু করে দাও যেন অন্য কেউই তা শুনতে না পায়? তোমাদের এ নির্লজ্জতার জন্য তোমাদের কি কান্নার উদ্রেক হয় না? তোমাদের এ আচরণ হতে বিরত হও, আল্লাহর নিকট নতি স্বীকারে- অবনমিত হও এবং একমাত্র তাঁরই বন্দেগী ও দাসত্ব কবুল কর।

সূরাটির উপসংহারের একথাগুলো অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ও অতিশয় প্রভাবশালী। একথাগুলো শুনে কঠিন-কঠোর খোদাদ্রোহী লোকেরাও নিজেদেরকে সংবরণ করতে পারেনি। রাসূলে কারীম (সা) যখন খোদার কালামের এ বাক্যসমূহ পাঠ করে সিজদায়ে পড়ে গেলেন তখন উপস্থিত সমস্ত লোকই স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর সংগে সংগে সিজদায়ে পড়ে গেলেন। (তাফহীম)

وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ.

অনুবাদ

"আকাশমণ্ডলীতে যা কিছু আছে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহরই।"

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

মানুষের দৃষ্টি আকাশমন্ডলীতে ও পৃথিবীতে যা কিছু দেখতে পায় এবং যা কিছু দেখতে পায় না তার সব কিছুর মালিক আল্লাহ তা'আলা। অপর আয়াতে এর সমর্থন রয়েছে ঃ

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ.

আকাশ ও পৃথিবী এবং উহার মধ্যে অবস্থিত যাবতীয় বস্তুর মালিক

আল্লাহ। আর সব কিছু তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন করবে। (সূরা আল-মায়েদা ঃ ১৮)

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا (ط) اِنْ كُنْتُمْ مُوْقِنِيْنَ.

তিনি আসমান ও যমীনের প্রতিপালক এবং সে সব বস্তুর, যা কিছু আসমান ও যমীনের মধ্যে আছে, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। (সূরা আশ-শোয়ারা ঃ ২৪)

ذَالِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ (ط) وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مَايَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ.

সে আল্লাহ তোমাদের প্রতিপালক। মালিকানা একমাত্র তাঁরই, তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য যাদেরকে তোমরা ডাক, তারা একটি তৃণ খণ্ডেরও মালিক নয়। (সূরা আল-ফাতির ঃ ১৩)

لِيُجْزِىَ الَّذِيْنَ اَسَاءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيْجِزِىَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى.

অনুবাদ

"যারা মন্দ কর্ম করে তাদেরকে তিনি দেন মন্দ ফল এবং যারা সৎকর্ম করে তাদেরকে দেন উত্তম পুরস্কার।"

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

আল্লাহ তা'য়ালা প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার আমল অনুয়াযী প্রতিদান দিবেন।

وَاِنَّ كُلاًّ لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ اَعْمَالَهُمْ (ط) اِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ.

"যখন সময় আসবে তখন অবশ্যই তোমার প্রতিপালক উহাদের প্রত্যেককে তার কর্মফল পুরোপুরি দিবেন। উহারা যাহা করে তিনি তো সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।" (সূরা হুদ ঃ ১১১)

اِنَّ اللّٰهَ لاَيَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ (ج) وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُّضعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَّدُنْهُ اَجْرًا عَظِيْمًا.

"আল্লাহ অণু পরিমাণও যুলুম করেন না। আর কোন পূণ্য কার্য হলে আল্লাহ উহাতে দ্বিগুণ করেন এবং আল্লাহ তাঁর নিকট হতে মহাপুরস্কার প্রদান করেন।" (সূরা আন-নিসা ঃ ৪০)

"যারা মঙ্গলকাজ করে তাদের জন্য আছে মঙ্গল এবং আরো অধিক। কালিমা ও হীনতা উহাদের মুখমন্ডলকে আচ্ছন্ন করবে না। উহারা জান্নাতের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ীভাবে বসবাস করবে।" (সূরা আল-ইউনুস ঃ ২৬)

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزَى اِلاَّ مِثْلَهَا وَهُمْ لاَيُظْلَمُوْنَ.

"কেহ কোন সৎকাজ করলে সে তার দশ গুণ প্রতিদান পাবে এবং কেহ কোন অসৎ কাজ করলে তাকে শুধু উহারই প্রতিফল দেয়া হবে, আর তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না।" (সূরা আল-আন'আম ঃ ১৬১)

"আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তিনি তাদের প্রতিফল পুরোপুরিভাবে প্রদান করবেন। আল্লাহ যালিমদেরকে পছন্দ করেন না।" (সূরা আলে-ইমরান ঃ ৫৭)

اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلاَّ اللَّمَمَ.

অনুবাদ

"যারা গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকে; যদিও ছোটখাট অপরাধ হয়ে থাকে।"

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

এ আয়াতে আল্লাহ তা"য়ালার নির্দেশ পালনকারী সৎ-বান্দাদের প্রশংসাসূচক আলোচনা করে তাদের পরিচয় এভাবে তুলে ধরেছেন যে, তারা সাধারণতঃ কবীরা তথা বড় বড় গূনাহ থেকে এবং বিশেষভাবে নির্লজ্জ ও অশ্লীল কাজকর্ম থেকে দূরে থাকে।

কবীরা গুনাহের সংজ্ঞা ঃ كَبِيْرَةٌ শব্দটি একবচন। এর বহুবচন হল كَبَائِرُ এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে বড় বা বৃহৎ।

পারিভাষিক অর্থ ঃ ১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) এর মতে ঃ كُلُّ مَانَهَى اللّٰهُ عَنْهُ فَهِىَ كَبِيْرَةٌ অর্থাৎ যে সকল কাজ করতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন তা-ই কবীরা গুনাহ।

২. ইমাম রাযীর মতে ঃ هِىَ الَّتِىْ مِقْدَارُهَا عَظِيْمٌ অর্থাৎ যে অপরাধে শাস্তির পরিমাণ বেশী তা-ই কবীরাহ গুনাহ।

৩. কারো কারো মতে ঃ اَلْكَبَائِرُ هِىَ الَّتِىْ يَجِبُ عَلَيْهَا الْحَدُّ অর্থাৎ যে কাজ করলে শাস্তি প্রযোজ্য হয় তা-ই কবীরাহ গুনাহ।

৪. কুরআনে যে সকল কাজ করা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে তা করা কবীরা গুনাহ।

৫. যে সকল অপরাধের ব্যাপারে আল্লাহ মানুষকে সতর্ক করেছেন।

৬. যে অপরাধের জন্যে লোকদেরকে ফাসিক বলে আখ্যায়িত করেছেন।

৭. আল্লাহ যে বিষয়গুলোকে মানার এবং করার নির্দেশ দিয়েছেন সেগুলো না মানা না করা।

৮. ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতে ঃ যে সকল গুনাহের ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে কঠিন শাস্তির কথা বলা হয়েছে সেগুলোই কবীরা গুনাহ।

ফাওয়াহিশ (فَوَاحِش) ঃ ফাহিশা (فَاحِشَةٌ) শব্দের বহুবচন হচ্ছে ফাওয়াহিশ। এর অর্থ কদর্য, অশালীন ও নির্লজ্জ কাজ। যা স্বভাবতই নোংরা ও কুৎসিত। যেমন- ব্যভিচার, মদ্য পান, উলঙ্গপনা ইত্যাদি।
লামাম (لمم) ঃ এর অর্থ সগীরা বা ছোটখাট গুনাহ। (لمم) দ্বারা ঐ সকল গুনাহকে বুঝায় যা কদাচিত সংঘটিত হয়ে যায়। অতঃপর তাওবা দ্বারা উহা চির তরে মুছে যায়।

কুরআনে বর্ণিত পাপ সাধারণত ঃ দু'প্রকার। যথা-

১. কবীরা গুনাহ;

২. সগীরা গুনাহ।

এ দু'প্রকার পাপ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوْهُ فِي الزُّبُرِ، وَكُلُّ صَغِيْرٍ وَّكَبِيْرٍ مُّسْتَطَرٌ.

তাদের প্রতিটি কৃতকর্ম 'আমলনামায়' আছে। প্রতিটি সগিরা এবং কবীরাই করা হয়েছে লিপিবদ্ধ। (সূরা আল-ক্বামার ঃ ৫২-৫৩)

প্রত্যেক পাপই তার নিম্নস্তর হিসেবে কবীরা এবং উচ্চস্তরের হিসেবে সগীরা।

সগীরা গুনাহ কখনো কখনো কবীরা গুনাহে পরিণত হয়ে যায়। এটা দুই অবস্থায় হয়।

১. সগীরা গুনাহ বার বার করলে কবীরা গুনাহে রূপ ধারণ করে।

২. সগীরা গুনাহ তুচ্ছ জ্ঞান করে করলে তা কবীরা গুনাহে পরিণত হয়।

সগিরা গুনাহ সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

وَإِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوْبِ فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يُهْلِكْنَهُ.

(مسند احمد)

"তোমরা সে সব গুনাহ থেকে বেঁচে থাক, যেগুলোকে হালকা ও সাধারণ মনে করা হয়ে থাকে। কারণ মানুষ হালকা গুনাহ করতে থাকে, শেষ পর্যন্ত তা তাকে ধ্বংস করে দেয়।" (মুসনাদে আহমদ)

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَاتُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلاً كَرِيْمًا.

"যেগুলো সম্পর্কে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে যদি তোমরা সে সব বড় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে পার, তবে আমি তোমাদের ক্রটি-বিচ্যুতিগুলো ক্ষমা করে দেব এবং সম্মানজনক স্থানে তোমাদের প্রবেশ করাব।" (সূরা আন-নিসা ঃ ৩১)

وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَاغَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ.

"যারা বড় বড় গুনাহ ও অশ্লীল কাজ থেকে বেঁচে থাকে এবং ক্রোধান্বিত

হয়েও ক্ষমা করে।" (সূরা আশ-শূরা ঃ ৩৭)

কবীরা গুনাহর ধরন তিনটি ঃ ১. যুলুম; ২.ফিসক ও মা'সিয়াত; ৩. ফুজূর।

এ তিনটি কারণে কোন কাজ কবীরা গুনাহে পরিণত হয়। বিস্তারিত আলোচনা নিম্নরূপ ঃ

এক. কারো অধিকার হরণ করা। সে অধিকার আল্লাহর, মাতা-পিতার, অন্য মানুষের বা হরণকারীর নিজেরও হতে পারে। তার পর যার অধিকার যত বেশী হবে তার অধিকার হরণও ঠিক তত বেশী কবীরা গুনাহ হবে। এ কারণেই গুনাহকে যুলুমও বলা হয়। আর এ জন্য কুরআনে শিরককে যুলুম বলা হয়েছে।

দুই. আল্লাহকে ভয় না করা এবং আল্লাহর মোকাবেলায় আত্মম্ভরিতা করা, এর ফলে মানুষ আল্লাহর আদেশ ও নিষেধের পরোয়া করে না। তাঁর নাফরমানী করার উদ্দেশ্যে ইচ্ছা করেই এমন কাজ করে যা করতে তিনি নিষেধ করেছেনএবং জেনে-বুঝে এমন কাজ থেকে বিরত থাকে যা করার জন্য তিনি হুকুম দিয়েছেন। এই নাফরমানী যে পরিমাণ নির্লজ্জতা, অহমিকা, দুঃসাহস ও আল্লাহভীতির মনোভাবে সমৃদ্ধ হবে গুনাহটিও ঠিক সেই পর্যায়ের কঠিন ও মারাত্মক হবে। এই অর্থের প্রেক্ষিতেই গুনাহের জন্য ফিসক ও মা'সিয়াত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

তিন. যে সমস্ত সম্পর্কের সুস্থতা ও বলিষ্ঠতার ওপর মানব জীবনের শান্তি ও নিরাপত্তা নির্ভর করে সেগুলো বিক্রিত ও ছিন্ন করা । এ সম্পর্ক বান্দা ও আল্লাহর মধ্যে এবং বান্দা ও বান্দার মধ্যে হতে পারে। আবার যে সম্পর্ক যত বেশী গুরুত্বপূর্ণ যা ছিন্ন করলে শান্তি ও নিরাপত্তার যত বেশী ক্ষতি হয় এবং যার ব্যাপারে যত বেশী নিরাপত্তার আশা করা যেতে পারে, তাকে ছিন্ন করা কেটে ফেলা ও নষ্ট করার গুনাহ তত বেশী বড় হয়। যেমন যিনা ও তার বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করুন। এ কাজটি আসলে সামাজিক ও সংস্কৃতিক ব্যবস্থায় বিপর্যয়ে ডেকে আনে। তাই এটি মূলত একটি বড়

গুনাহ কিন্তু এর বিভিন্ন অবস্থা গুনাহের ব্যাপারে একটি অন্যটির চেয়ে বেশী মারাত্মক। বিবাহিত ব্যক্তির যিনা করা অবিবাহিত ব্যক্তির যিনা করার তুলনায় অনেক কঠিন গূনাহ। বিবাহিতা মহিলার সাথে যিনা করা অবিবাহিতা মেয়ের সাথে যিনা করার তুলনায় অনেক বেশী দূষণীয়। প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যিনা করা অপ্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যিনা করার তুলনায় বেশী খারাপ। অন্য কোন স্থানে যিনা করার চেয়ে মসজিদে যিনা করা কঠিন গুনাহ। উপরে বর্ণিত কারণের ভিত্তিতে এ দৃষ্টান্তগুলোতে একই কাজের বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে গূনাহ হবার দিক দিয়ে পর্যায়ের পার্থক্য সূচিত হয়েছে। যেখানে নিরাপত্তার আশা যত বেশী, যেখানে মানবিক সম্পর্ক যত বেশী সম্মানের অধিকারী এবং যেখানে এই সম্পর্ক ছিন্ন করার যত বেশী বিপর্যয়ের কারণ বলে বিবেচিত হয়, সেখানে যিনা করা তত বেশী বড় গুনাহ। এই অর্থের প্রেক্ষিতে গুনাহের জন্য ফুজূরের পরিভাষা ব্যবহার করা হয়। (তাফহীমূল কুরআন সূরা নিসা টিকা ঃ ৫৩)

কবীরা গুনাহ কতটি?

কবীরা গুনাহের সংখ্যা সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে ব্যাপক মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃত পক্ষে কবীরা গুনাহের কোন পরিসংখ্যান নাই। তবে আমরা মনে করি, আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে যে কোন কাজ করা হোক না কেন, বান্দার জন্য উহা কবীরা গুনাহ। যেমন শিরক করা ও কুফরী করা ইত্যাদি। এ জন্য আল্লাহ তাআলা উহার সংখ্যা ও সংজ্ঞা গোপন রেখেছেন। রাসূল (স)-কে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল (স) সব চেয়ে বড় গুনাহ কোনটি? তিনি বললেন ঃ কাউকেও আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করা। অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। সে আবার জিজ্ঞেস করলেন এর পর কোনটি রসূল (স) বললেন তোমার সাথে খাওয়ায় ভাগ বসাবে এই ভয়ে তোমার সন্তানকে হত্যা করা। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন এর পর কোনটি তিনি বললেন ঃ আপন প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া এরই সমর্থনে আল্লাহ কুরআনে এ আয়াত নাযিল করলেন এবং যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোন

ইলাহকে ডাকে না, এবং যাকে হত্যা করা আল্লাহ হারাম করেছেন আইনের বিধান ব্যতিত তাকে হত্যা করে না আর ব্যভিচারে লিপ্ত হয় না। (বুখারী ও মুসলিম)

কবীরা গুনাহের সংখ্যা ঃ কবীরা গুনাহের সংখ্যা নিয়ে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ আছে ঃ প্রকৃত পক্ষে কবীরা গুনাহের কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই। কেননা কবীরা ও সগীরা দু'টিই আপেক্ষিক বিষয়। এজন্য প্রত্যেকটি গুনাহই তার ছোটটির তুলনায় কবীরা এবং তার বড়টির তুলনায় সগীরা। তাই এর সংখ্যার দিক দিয়েও মতভেদ রয়েছে ঃ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে কবীরা গুনাহের সংখ্যা প্রায় ৭০০টি।

ইমাম শামসুদ্দীন আযযাহাবী (র) তার রচিত কিতাবুল কাবায়ের গ্রন্থে ৭০টি কবীরা গুনাহের কথা উল্লেখ করেছেন। গুনাহ তাওবা ক্ষমা গ্রন্থকার আমাদের সমাজে প্রচলিত ১৩৩টি কবীরা গুনাহের কথা উল্লেখ করেছেন।

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-এর মতে কবীরা গুনাহ ৭টি। যথা- ১. আল্লাহর সাথে শিরক করা; ২. মানুষ হত্যা করা; ৩. পবিত্র চরিত্রের অধিকারিণী মুমিন নারীর ওপর ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া; ৪. যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা; ৫. এতীমের সম্পদ আত্মসাৎ করা; ৬. পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া; ৭. যিনা করা।

২. হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, কবীরা গুনাহ ৮টি। যথা- ১. আল্লাহর সাথে শিরক করা; ২. মানুষ হত্যা করা; ৩. পবিত্র চরিত্রের অধিকারিণী মু'মিন নারীর ওপর ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া; ৪. যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা; ৫. এতীমের সম্পদ আত্মসাৎ করা; ৬. পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া; ৭. যিনা করা; ৮. সুদ খাওয়া।

৩. হযরত আলী (রা)-এর মতে কবীরা গুনাহের সংখ্যা ১০টি। যথা- ১. আল্লাহর সাথে শিরক করা; ২. মানুষ হত্যা করা; ৩. পবিত্র চরিত্রের অধিকারিণী মুমিন নারীর উপর ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া; ৪. যুদ্ধের

ময়দান থেকে পলায়ন করা; ৫. এতীমের সম্পদ আত্মসাৎ করা; ৬. পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া; ৭. যিনা করা; ৮. সূদ খাওয়া; ৯. চুরি করা; ১০. মদ পান করা।

৪. কারো কারো মতে এর সংখ্যা ১৮টি। যথা-১. আল্লাহর সাথে শিরক করা; ২. মানুষ হত্যা করা; ৩. পবিত্র চরিত্রের অধিকারিণী মুমিন নারীর ওপর ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া; ৪. যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা; ৫. এতীমের সম্পদ আত্মসাৎ করা; ৬. পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া; ৭. ঘুষ লওয়া; ৮. সুদ খাওয়া; ৯. চুরি করা; ১০. মদ পান করা; ১১. যিনা করা; ১২. সমকামিতা; ১৩. যাদু করা; ১৪. মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া; ১৫. মিথ্যা কসম খাওয়া; ১৬. গীবত করা; ১৭.ওজনে কম দেয়া; ১৮. হেরেম শরীফে কোন প্রকার গুনাহ্ করা।

৫. কারো কারো মতে এর সংখ্যা ২০টি। যথা- ১. অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা; ২. যিনা করা; ৩. সমকামিতা; পবিত্র চরিত্রের অধিকারিণী মুমিন নারীর ওপর ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া; ৪. . চুরি করা; ৫. মাদক দ্রব্য পান করা; ৬. শুকরের মাংশ খাওয়া; ৭. অন্যায়ভাবে অপরের মাল ভোগ করা; ৮. যুলুম করা। ৯. পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া; ১০. সুদ খাওয়া; ১১. মিথ্যা কসম খাওয়া ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া; ১২.এতীমের সম্পদ আত্মসাৎ করা; ১৩. ঘুষ লওয়া; ১৪. মাপে-ওজনে কম দেয়া; ১৫. কোন সাহাবীকে মন্দ বলা; ১৬. রাসূল (স)-এর নামে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা; ১৭. আল্লাহর শাস্তি হতে নির্ভয় হওয়া; ১৮. যাদু বা বান-টোনা করা; ১৯. গণক ঠাকুরের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করা; ২০. হেরেম শরীফে কোন প্রকার গুনাহ্ করা।

কবীরা গুনাহ্কারীর বিধান ঃ কবীরা গুনাহর জন্য তাওবা করা জরুরী। সগীরা গুনাহ নেক কাজের দ্বারা মাফ হয়ে যায়। কিন্তু তাওবা ছাড়া কবীরা গুনাহ মাফ হবে না। মু'তাযিলাগণ বলেন ঃ মু'মিন কবীরা গুনাহ্ করলে তার ঈমান থাকে না এবং কাফেরও হয় না বরং উভয়ের মধ্যবর্তী এক অবস্থায় থাকে। খারেজীদের মত হচ্ছে ঃ কবীরা গুনাহ করলে সে কাফের

হয়ে যায়। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতগণ বলেন ঃ সে কাফের হবে না বরং তাকে বলা হবে 'মু'মিনে ফাসেক'।

إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ.

অনুবাদ

"তোমার প্রতিপালকের ক্ষমা অপরিসীম।"

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

আল্লাহ তা'য়ালার ক্ষমা অপরিসীম বলেই মানুষ গুনাহ করে সাথে সাথে তাওবা করলে তাকে ক্ষমা করে থাকেন।

يَاعِبَادِيْ اِنَّكُمْ تَخْطِئُوْنَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَاَنَا اَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا فَاسْتَغْفِرُوْنِيْ اَغْفِرْلَكُمْ. (رواه مسلم)

"হে আমার বান্দারা! তোমরা রাতদিন গুনাহ-খাতা-অপরাধ করে চলছো, আর আমি তামাম অপরাধই ক্ষমা করে থাকি। সুতরাং তোমরা আমার কাছে ক্ষমা চাও, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দেবো।" (মুসলিম)

"আল্লাহ রাত্রিবেলা তাঁর ক্ষমার হাত প্রসারিত করে দেন-যাতে করে দিনের গুনাহগার বান্দারা অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চেয়ে নেয়। তিনি আবার দিনের বেলা তাঁর ক্ষমার হাত প্রসারিত করে দেন-যাতে করে রাতের গুনাহগার বান্দারা অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চেয়ে নেয়। তিনি এমনটি করে থাকবেন-যতোদিন না সূর্য তার অস্তাচল থেকে উদিত হয়।" (মুসলিম)

هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ.

অনুবাদ

"আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সম্যক অবগত। যখন তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলেন মাটি হতে এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে ভ্রূণরূপে ছিলে।"

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

আদম (আ)-কে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষ তার মাতৃগর্ভে সৃষ্টির

বিভিন্ন স্তর অতিক্রমকালে অচেতন থাকে। আল্লাহ তা'য়ালা বিজ্ঞানসম্মতভাবে তার গঠন প্রক্রিয়ার সকল আয়োজন করে থাকেন। জন্মের পরে সে যে ভাল কাজ করে তাও আল্লাহর অনুগ্রহ। কারণ, কাজ করার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তিনি তৈরী করেছেন। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তিনি গতিশীল করেছেন। সৎকাজের প্রেরণা ও সংকল্প তাঁরই তাওফীক দ্বারা হয়। কাজেই মানুষ যতই সৎকাজ করুক না কেন তাতে গর্ব করার কিছু নেই। তাছাড়া 'শেষ ভাল যার সব ভাল তার' মানুষ তার শেষ পরিণতি সম্পর্কে জানে না সে ভাল কাজের সাথে সমাপ্তি হবে না মন্দ কাজে। হযরত সাবেত ইবনে হারেস আনসারী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ যখন ইহুদীদের কোন ছোট শিশু মৃত্যু বরণ করত তখন তারা বলত 'সাদিকুন' সত্যবাদী। রাসূল (স)-এর নিকট এ সংবাদ পৌঁছার পর তিনি বললেন ঃ ইহুদীরা মিথ্যা বলেছে। প্রকৃত কথা এই যে, প্রত্যেক শিশুকে আল্লাহ তা'য়ালা মাতৃগর্ভে সৃষ্টি করেন-হয় সে নেককার হবেন অথবা গূনাহগার। এ সময় আল্লাহ তা'য়ালা এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন।

فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ (ط) هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى.

অনুবাদ

"অতঃএব তোমরা আত্মপবিত্রতার দাবী করো না। প্রকৃত মুত্তাকী কে আল্লাহ তা ভাল করেই জানেন।"

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তোমরা তোমাদের নিজেদের ব্যাপারে পবিত্রতা দাবী করো না। কারণ, আল্লাহ তা'য়ালা ভালভাবেই জানেন কার পবিত্রতা কতটুকু। শ্রেষ্ঠত্ব খোদাভীতির ওপর নির্ভরশীল-বাহ্যিক কাজ-কর্মের ওপর নয়। কালবী ও মুকাতিল বলেছেন ঃ কিছু লোক আমলে সালেহ বা নেক আমল করত, অতঃপর আমাদের নামায, আমাদের সিয়াম, আমাদের হজ্জ ও আমাদের জিহাদ বলে তাদের আমলের গর্ব করত তখন এ আয়াত অবতীর্ণ করে তাদের গর্ব সম্পর্কে ভুল ধারণা প্রকাশ করেন। (তাফসীরে খাযেন)

তাফসীরে মাআরেফুল কুরআনে এ আয়াত অবতীর্ণের্র যে ঘটনা উল্লেখ করেছেন তা হল এই ঃ দুররে-মনসুরে ইবনে জারীর (র)-এর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে যে, জনৈক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে তার বন্ধু এই বলে তাকে তিরস্কার করল যে, তুমি পৈতৃক ধর্ম কেন ছেড়ে দিলে? সে বলল ঃ আমি আল্লাহ্র শাস্তিকে ভয় করি। বন্ধু বলল ঃ তুমি আমাকে কিছু অর্থকড়ি দিলে তোমার শাস্তি নিজের কাঁধে তুলে নেব। ফলে তুমি বেঁচে যাবে। সে মতে সে বন্ধুকে কিছু অর্থকড়ি দিল। বন্ধু আরো চাইলে সে সামান্য ইতস্ততঃ করার পর আরো দিল এবং অবশিষ্ট অর্থের একটি দলিল লিখে দিল। রুহুল মা'আনীতে এই ব্যক্তির নাম ওলীদ ইবনে-মুগীরা লিখিত আছে। পরবর্তীতে সে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। (মা'আরেফুল কুরআন ঃ ১৩০৮)

শিক্ষা

১. সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালা।

২.আল্লাহ্ তা'য়ালা যথাযথভাবে প্রত্যেকটি কাজের প্রতিদান প্রদান করবেন।

৩. কবীরা গুনাহ্ থেকে সকলেরই বেঁচে থাকা উচিৎ।

৪.কবীরা গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকলে আল্লাহ্ তা'য়ালা ছগীরা গুনাহ মাফ করে দেবেন।

৫. আত্মপবিত্রতার দাবী করা উচিৎ নয়; প্রকৃত মুত্তাকী কে তা আল্লাহ তা'য়ালা ভাল করে জানেন।

১০

আযাব থেকে বাঁচার উপায়

৬১. সূরা আস্-সাফ

মদীনায় অবতীর্ণ ঃ আয়াত ১৪, রুকু-২

আলোচ্য আয়াত ঃ ১০-১৩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি।

(١٠) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ (١١) تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ. (١٢) يَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ط وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ط ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ. (١٣) وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ ط وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ.

অনুবাদ ঃ (১০) হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি ব্যবসায়ের সন্ধান দেবো যা তোমাদেরকে কঠিন আযাব থেকে মুক্তি দেবে? (১১) তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আন এবং আল্লাহর পথে অর্থ-সম্পদ ও জান-প্রাণ দিয়ে জিহাদ কর এটাই তোমাদের জন্য অতীব কল্যাণকর যদি তোমরা তা বোঝ। (১২) আল্লাহ তোমাদের গুনাহ মাফ

করে দেবেন এবং তোমাদেরকে এমন সব জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার নিচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত। আর চিরস্থায়ী বসবাসের জায়গা জান্নাতের মধ্যে সর্বোত্তম বাসগৃহে। এটা মহাসাফল্য। (১৩) আর একটি অনুগ্রহ দিবেন, যা তোমরা পছন্দ করো। আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়। মু'মিনদেরকে এর সুসংবাদ দান করুন।

শব্দার্থ ঃ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ঃ হে ঈমানদারগণ! هَلْ ঃ কি? اَدُلُّكُمْ ঃ আমি তোমাদের সন্ধান দিব। تِجَارَةٍ ঃ ব্যবসা। تُنْجِيْكُمْ ঃ তোমাদের মুক্তি দিবে। عَذَابٍ اَلِيْـمٍ ঃ যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি। تُؤْمِنُوْنَ ঃ তোমরা ঈমান আনো। بِـاللّٰهِ ঃ আল্লাহর ওপর। وَرَسُوْلِـهٖ ঃ তাঁর রাসূলের ওপর। وَتُجَـاهِدُوْنَ ঃ তোমরা জিহাদ করো। فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ঃ আল্লাহর পথে। بِـاَمْوَالِكُمْ ঃ তোমাদের ধন-সম্পদ দিয়ে। وَاَنْفُسِكُمْ ঃ তোমাদের জীবন দিয়ে। ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ ঃ এটা তোমাদের জন্য উত্তম। اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ঃ যদি তোমরা বুঝো। يَغْفِرْلَكُمْ ঃ তিনি তোমাদের ক্ষমা করবেন। ذُنُوْبَكُمْ ঃ তোমাদের গুনাহসমূহ। وَيُدْخِلْكُمْ ঃ তিনি তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন। جَنّٰتٍ ঃ জান্নাতে। تَجْرِىْ ঃ প্রবাহিত হয়। مِنْ تَحْتِهَا তার পাদদেশে। الْاَنْهٰرُ ঃ ঝর্ণাধারাসমূহ। وَمَسَاكِنَ ঃ বাগানসমূহ। طَيِّبَةً ঃ পবিত্র। فِىْ جَنّٰـتٍ ঃ জান্নাতের মধ্যে। عَدْنٍ ঃ চিরস্থায়ী। ذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ঃ এটাই বড় সফলতা। وَاُخْـرٰى ঃ এবং অন্য। تُحِبُّوْنَهَا ঃ যা তোমরা পছন্দ করো। نَصْرٌ ঃ সাহায্য। مِنَ اللّٰهِ ঃ আল্লাহর পক্ষ থেকে। وَفَتْحٌ ঃ বিজয়। قَرِيْبٌ ঃ আসন্ন। وَبَشِّرِ ঃ এবং আপনি সুসংবাদ দিন। الْمُؤْمِنِيْنَ ঃ মু'মিনদের।

নামকরণ ঃ এ সূরার ৪র্থ আয়াতে يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا এর صَفًّا ঃ শব্দটিকেই সূরার নাম হিসেবে চয়ন করা হয়েছে। অর্থাৎ এটি সেই সূরা যাতে 'সফ' শব্দটি আছে।

নাযিলের সময়-কাল ঃ ইহার বিষয়বস্তুর দিকে লক্ষ্য করলে প্রতিয়মান হয় যে, এ সূরাটি সম্ভবত ওহুদ যুদ্ধের সমসাময়িককালে নাযিল হয়ে থাকবে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য ঃ আলোচ্য আয়াতে ঈমানদারদের বলা হয়েছে যে,

দুনিয়ায় এবং আখিরাতে সফলতা লাভের পথ মাত্র একটি তা হচ্ছে খাঁটি ও সরল মনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আনো এবং জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করো। এর ফল হিসেবে আখিরাতে পাবে আল্লাহর আযাব থেকে মুক্তি গোনাহ সমূহের মাগফিরাত এবং চিরদিনের জন্য জান্নাত আর দুনিয়াতে পুরস্কার হিসেবে পাবে আল্লাহর সাহায্য এবং বিজয়। (তাফহীম)

শানে নুযূল ঃ তাফসীরে কাবীরে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে। সাহাবীগণ বলাবলি করছিলেন আমরা যদি জানতাম আল্লাহ তা'য়ালার নিকট কোন কাজটি সর্বাধিক প্রিয়, তাহলে আমরা সে কাজটি করতাম। সাহাবীদের এ জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে উল্লেখিত আয়াত সমূহ অবতীর্ণ হয়।

আয়াতের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ.

অনুবাদ

"হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি ব্যবসায়ের সন্ধান দেবো যা তোমাদেরকে কঠিন আযাব থেকে মুক্তি দেবে?"

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

এ আয়াতে মুসলমানদের নেক কাজসমূহের প্রতি আনন্দিত করা হয়েছে এবং তার ভালো প্রতিফল সম্বন্ধে অবগত করে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ হে মু'মিনগণ! তোমাদেরকে পরকালীন কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে পরিত্রাণদানকারী একটা সুন্দর সুপথের দিশারী করে দিতে আমি ইচ্ছা করছি। এতে তোমাদের অভিমত কেমন? এ প্রশ্ন করে আসলে মুসলমানদের অভিমত চাওয়া হয়নি; বরং তাদেরকে তার প্রতি আগ্রহী করার জন্য প্রশ্ন করা হয়েছে। আর আয়াতের বর্ণনা ভঙ্গিতে বুঝা যায় যে,

এতে মুসলমানগণ সম্মত হয়েছে। তাই আল্লাহ তা'য়ালা মু'মিন বান্দাদের উদ্দেশ্য করে বলেন ঃ 'তোমাদের সার্বিক কল্যাণ নিহিত এমন একটি ব্যবসা কি তোমাদের শিক্ষা দেব? এ চিত্তাকর্ষক প্রশ্নটি দ্বারা শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে সর্বোত্তম শিক্ষকের নীতি অনুযায়ী পরের আয়াতে ব্যবসার পুঁজি ও লাভের বর্ণনা দিচ্ছেন।

ব্যবসা হলো কোনো বস্তুর বিনিময়ে অন্যকোনো বস্তু গ্রহণ করা। ব্যবসা যেরূপ ব্যবসায়ীকে দারিদ্রের কষ্ট হতে মুক্ত রাখে, ঠিক তেমনি এ ব্যবসা অর্থাৎ আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান এবং আল্লাহর পথে জিহাদও মানুষকে আল্লাহর আযাব থেকে মুক্ত রাখবে।(তাফসীরে কাবীর)

تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

অনুবাদ

তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আন এবং আল্লাহর পথে অর্থ-সম্পদ ও জান-প্রাণ দিয়ে জিহাদ কর এটাই তোমাদের জন্য অতীব কল্যাণকর যদি তোমরা তা বোঝ।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

এখানে ঈমানদার লোকদেরকে ঈমান আনার কথা বলা হয়েছে। এর অর্থ হলো 'খাঁটি ও নিষ্ঠাবান মুসলমান হও'। ঈমানের শুধু মৌখিক দাবিকেই যথেষ্ট মনে করা যাবে না, বরং যে জিনিসের প্রতি ঈমান এনেছ, সেই জিনিসের জন্য সর্ব প্রকার ত্যাগ ও দুঃখ-কষ্ট স্বীকার করার জন্য প্রস্তুত হও। অতঃপর ব্যবসার মূল-ধন বা পুঁজি কি হবে তা বলে দেয়া হয়েছে ।

প্রথম পুঁজি ঃ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনবে।

দ্বিতীয় পুঁজি ঃ আল্লাহর পথে অর্থ-সম্পদ ও জান-প্রাণ দিয়ে জিহাদ করবে।

একে ব্যবসা বলা হয়েছে। কেননা, যেভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যে কিছু সম্পদ ব্যয় করার মাধ্যমে সম্পদ লাভ হয় সেভাবেই ঈমান বহাল রেখে আল্লাহর

পথে প্রাণ ও সম্পদ ব্যয় করার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালীন স্থায়ী নিয়ামত অর্জন হয়। (মা'আরিফুল কুরআন)

আল্লাহর পথে অর্থ-সম্পদ ও জান-প্রাণ দিয়ে হলেও ইসলামের দুশমনদের মোকাবিলায় দীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জিহাদ করতে হবে। কারণ, এ ব্যবসা দুনিয়ার প্রচলিত সর্বপ্রকার ব্যবসা-বাণিজ্য হতে অধিক উত্তম। যদি আমরা বুঝি। অর্থাৎ আমাদের জ্ঞান ও বোধশক্তি থাকলে আমাদেরকে এ কাজ করতে হবে। জীবন ও সম্পদ তো আল্লাহরই তাই দিয়ে তার পথে লড়তে হবে।

إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ط يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ.

"নিশ্চয়ই আল্লাহ মু'মিনদের জান-মাল জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে মারে ও মরে।"

আল্লাহ তা'আলা এখানে কায়িক জিহাদ ও আর্থিক জিহাদের কথা বলেছেন।

ক. কায়িক জিহাদ ঃ খোদাদ্রোহী ও ইসলাম বিরোধী সকল অপশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য দৈহিক ভাবে অংশ গ্রহণ করাই হলো কায়িক জিহাদ ।

وَقَاتِلُوهُمْ حَتّٰى لاَ تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّ يَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّه لِلّٰهِ.

"ফিতনা নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত এবং আল্লাহর দীন পূর্ণাঙ্গভাবে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম কর।" (আনফাল ঃ ৩৯)

وَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُ.

"যেখানে পাও মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই কর।"

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَ هُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ، وَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ.

“জিহাদ তোমাদের উপর ফরয করা হয়েছে, যদিও তা তোমাদের জন্য কষ্টকর হোক না কেন। কোন জিনিস তোমাদের জন্য কষ্টকর মনে হলেও তাতে তোমাদের জন্য কল্যাণ নিহিত রয়েছে।” (আল-বাকারা ঃ ২১৬)

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ.

“ঈমানদারগণ আল্লাহর পথে লড়াই করে। আর কাফিরেরা লড়াই করে তাগুতের পথে।” (আন-নিসা ঃ ৭৬)

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ.

“আল্লাহ তো ভালবাসেন সেই লোকদেরকে যারা তার পথে এমনভাবে কাতারবন্দী হয়ে লড়াই করে যেন তারা সীসা ঢালা প্রচীর।” (সূরা-সফ ঃ ৪)

খ. আর্থিক জিহাদ ঃ আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ধন-সম্পদ ব্যয় করা অপরিহার্য। অর্থ ব্যয় করা ছাড়া কোন কাজই সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা যায় না। যখনই ধন সম্পদ ব্যয় করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তখনই প্রয়োজন মাফিক ব্যয় করা উচিত। কখনো কখনো এর প্রয়োজনীয়তা অধিক পরিমাণে দেখা দেয়। তখন অকাতরে অর্থ ব্যয় করাই হলো আর্থিক জিহাদ।

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالاً وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ.

“যুদ্ধের উপকরণ তোমাদের অল্প হোক কিংবা অধিক হোক তোমরা সশস্ত্র সংগ্রামে বের হও এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন বিলিয়ে দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ কর।” (আত তাওবা ঃ ৪১)

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ.

আল্লাহর নিকট তো-সেই লোকদেরই অতি বড় মর্যাদা যারা তার পথে ঘরবাড়ী ছেড়েছে, নিজের সম্পদ ও জীবন দিয়ে সংগ্রাম করেছে, তারাই সফলকামী। (সূরা আত-তাওবা ঃ ২০)

يَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ.

অনুবাদ

আল্লাহ্ তোমাদের গুনাহ্ মাফ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে এমন সব জান্নাতে প্রবেশ করবেন যার নিচে দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

তোমরা আল্লাহ্র উপর ঈমান আনো, আর আল্লাহ্র পথে জিহাদ করো, যদি তোমরা তা করো, তাহলে (আল্লাহ্ তা'আলা) তোমাদের গুনাহ্ খাতা মাফ করে দেবেন এবং তোমাদেরকে এমন সব বাগ-বাগিচায় প্রবেশ করাবেন যে সবের তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত এবং চিরকাল অবস্থিতির জান্নাতে অতীব উত্তম ঘর তোমাদের দান করবেন। এটা বিরাট সাফল্য। (কাবীর)

ব্যবসার আসল লাভ তিনটি। যথা ঃ

১. আযাব থেকে নিস্কৃতি লাভ;

২. গুনাহ্ থেকে ক্ষমা লাভ;

৩. জান্নাত লাভ।

وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ، سَيَهْدِيْهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ.

"যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয় আল্লাহ্ কখনো তাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করবেন না। তিনি তাদের পথ দেখাবেন এবং সুসংহত করে দেবেন। সেই জান্নাতে তাদের দাখিল করবেন, যার সম্পর্কে পূর্বে তাদের অবহিত করেছেন।" (মুহাম্মদ ঃ ৪-৬)

وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ، ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

অনুবাদ

"আর চিরস্থায়ী বসবাসের জায়গা জান্নাতের মধ্যে সর্বোত্তম বাসগৃহে। এটা মহাসাফল্য।"

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বিশ্বাসী বান্দাদের জন্য জান্নাতে অফুরন্ত ও অতুলনীয় নি'য়ামত রাজির ব্যবস্থা করে রেখেছেন। সেখানের সুখ-শান্তি ও আরাম-আয়েশ কল্পনাতীত। আর এর নামই হচ্ছে জান্নাত। আর এখানে তারা চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করবে। দুনিয়ার মানুষ জান্নাতের সুসজ্জিত এ সকল নি'য়ামত রাজির কল্পনাও করতে পারে না । হাদীসে কুদসীতে যেভাবে বর্ণনা এসেছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَعْدَدْتُ لِعِبَادِىَ الصَّالِحِيْنَ مَالاَعَيْنٌ رَاَتْ وَلاَ اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ.

মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন ঃ আমার সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্য এমন পুরস্কার প্রস্তুত রয়েছে, যা কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কর্ণ শোনেনি এবং কোন মানব হৃদয় কল্পনা করেনি। (বুখারী-মুসলিম)

عَنِ النَّبِىِّ (صلعم) اِذَا دَخَلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ يُنَادِىْ اِنَّ لَكُمْ تَصِحُّوْا فَلاَ يَسْقَمُوْا اَبَدًا وَاِنَّ لَكُمْ اَنْ تَحْيَوْا فَلاَ تَمُوْتُوْا اَبَدًا وَاِنَّ لَكُمْ تَشِبُّوْا فَلاَ تَهْرَمُوْا اَبَدًا وَاِنَّ لَكُمْ اَنْ تَنْعَمُوْا فَلاَ تَبْاَسُوْا اَبَدًا –(مسلم، ترمذى)

অর্থ ঃ যখন বেহেশতীগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন ঘোষণা করা হবে ঃ 'হে জান্নাতীগণ! এখন আর তোমরা কোন দিন অসুস্থ হবে না। সর্বদা সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান থাকবে। কোনদিন আর তোমাদের মৃত্যু হবে না; অনন্তকাল জীবিত থাকবে। সর্বদা যুবক থাকবে কখনো বুড়ো হবে না। সর্বদা অফুরন্ত নি'য়ামত ভোগ করবে; কোন দিন তা শেষ হবে না। কখনো দুঃখ-কষ্টে, ক্ষুধা- অনাহারে থাকবে না।' (মুসলিম, তিরমিযী)

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِىْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ اُكُلُهَا دَائِمٌ.

মুত্তাকীদের পুরস্কার হিসেবে যে জান্নাতের কথা বলা হয়েছে, তার উপমা সেই উদ্যানের মত যার তলদেশ দিয়ে ঝর্নাধারা প্রবাহিত এবং যার ফল-ফলাদি চিরস্থায়ী ও অনন্ত।

وَأُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا نَصْرٌ مِنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ.

অনুবাদ

আর একটি অনুগ্রহ দিবেন, যা তোমরা পছন্দ করো। আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়। মু'মিনদেরকে এর সুসংবাদ দান করুন।

ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ

পরকালে আল্লাহর আযাব হতে নিষ্কৃতি গুনাহ ক্ষমা ও জান্নাত তো পাওয়া যাবেই, সাথে সাথে ইহকালেও এমন একটি নগদ নি'আমত পাওয়া যাবে যা তোমরা পছন্দ করবে। সেই নি'আমত হলো আল্লাহ তা'আলার সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়। পরকালীন জীবনের যে ফল পাওয়া যাবে তার কথা সর্বপ্রথম উল্লেখ করা হয়েছে, এরপর দুনিয়ার জীবনে যে ফল পাওয়া যাবে তার উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ, দুনিয়ার বিজয় ও সাফল্য আল্লাহ তা'য়ালার একটি অতি বড় নি'আমত হওয়া সত্ত্বেও মু'মিনদের নিকট এর গুরুত্ব আখিরাতের সাফল্যের তুলনায় কম। তাই পরকালীন সাফল্যের কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। 'নিকটবর্তী বিজয়' বলতে হযরত ইবনে আব্বাসের মতে পারস্য ও রোম রাজ্য বিজয়ের কথা বুঝানো হয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন মক্কা বিজয়ের কথা বুঝানো হয়েছে। আমাদের মতে দুনিয়ার যে কোন বিজয় হতে পারে। ইসলামপন্থিরাই ইসলামী বিধি-বিধান মতে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। কুরআন আর সন্নাহ-ই হবে সে রাষ্ট্রের সংবিধান। রাসূল (স)-এর সময়ে, খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে এবং তারপরও এভাবে ইসলাম বিজয়ী ছিল। দীর্ঘদিন পর্যন্ত কেবল ইসলামী বিধান মতোই রাষ্ট্র পরিচালিত হয়েছিল; পরে বিভিন্ন কারণে ইসলাম আর বিজয়ী থাকেনি। অদূর ভবিষ্যতেও ইসলাম আবার বিজয়ী হবে ইনশাআল্লাহ। ইতোমধ্যেই ইসলামের বিজয়ী হবার আলামত বিশ্বব্যাপী লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

শিক্ষা

১. কঠিন আযাব থেকে মুক্তির জন্য ইসলামী আন্দোলনে শামিল হওয়া।

২. আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনয়ন করা।

৩. আল্লাহর সাথে ব্যবসার পুঁজি জান-মাল দিয়ে জিহাদ করা।

৪. তাহলে ব্যবসার চারটি লাভ পাওয়া যাবে। যথা ঃ

ক. আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়।

খ. সকল পাপের ক্ষমা লাভ।

গ. কঠিন আযাব থেকে মুক্তি।

ঘ. জান্নাতের মধ্যে সর্বোত্তম বাসস্থান।

সমাপ্ত

আরজু পাবলিকেশন্স প্রকাশিত ও ঢাকা বুক কর্ণার পরিবেশিত অন্যান্য বইসমূহ

- আদাবে জিন্দেগী- আল্লামা ইউসুফ ইসলাহী
- বিজ্ঞানময় কোরআন Al-quran is All Science- মুহাম্মদ আবু তালেব
- ইসলামের সমাজ দর্শন- মাও. সদরুদ্দীন ইসলাহী
- মহররমের শিক্ষা- সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহঃ)
- ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ (রহঃ) - মাও. রশীদ আখতার নদভী
- ইসলামের পুনর্জাগরণে ইখওয়ানুল মুসলিমুনের ভূমিকা- মাও. খলীল আহমদ হামেদী
- রোযার মর্মকথা- ইমাম গাজ্জালী (রহঃ)
- ভ্রূণের আর্তনাদ- শাহীন বেগম
- ৪০ হাদীস : ব্যাখ্যা ও শিক্ষা সম্বলিত- মাওলানা হামিদা পারভীন
- দারসুল কুরআন ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড- মাওলানা হামিদা পারভীন
- ইসলাম বিদ্বেষীদের অপপ্রচারের জবাব- আবু বকর সিদ্দীক
- ছোটদের ইমাম বোখারী- নূর মোহাম্মদ মল্লিক
- ছোটদের শহীদ হাসানুল বান্না- নূর মোহাম্মদ মল্লিক
- ফুটলো গোলাপ মিশরে-নূর মোহাম্মদ মল্লিক
- ফুটলো গোলাপ ইরান দেশে- নূর মোহাম্মদ মল্লিক
- সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য- ড. হাসান জামান
- ইসলামী শিক্ষার অগ্রগতির পথে- ড. হাসান জামান
- আত্মশুদ্ধির পথ- হাসানুল বান্না
- দু:সাহসিক অভিযাত্রা- ড. মুহাম্মদ রেজাউল করিম
- ইসলামী আন্দোলন কর্মীদের নিষ্ক্রীয়তার কারণ ও প্রতিকার- ডা. মুহাম্মদ ইলিয়াস

আরজু পাবলিকেশন্স

পরিবেশক

ঢাকা বুক কর্ণার

৬৩ডি পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

ফোন : ০১৭১১০৩০৭১৬, ০১৯১৭২০৬৫০৪